আদি ও অকৃত্রিম

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্রালয়

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি[illegible]

—তিন টাকা চার আনা—

রণ দে স্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা
[illegible] লেন হইতে যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত।

এই লেখকের লেখা

—গল্প সংগ্রহ—

আদি ও অকৃত্রিম

অঙ্গার
অঙ্গরাগ
এই যুদ্ধ
চেনা ও জানা
বন্যাসঙ্গিনী
তরঙ্গ
পঞ্চতীর্থ

—ভ্রমণ বৃত্তান্ত—

মহাপ্রস্থানের পথে
দেশদেশান্তর
ভ্রমণ ও কাহিনী
পাঞ্জাব সীমান্তের পথে
অরণ্যপথ
ইতস্ততঃ

—উপন্যাস—

শ্যামলীর স্বপ্ন
জয়ন্ত
আঁকাবাঁকা
জীবন-মৃত্যু
কাজল-লতা
স্বাগতম্
সরল রেখা
বন্দী বিহঙ্গ
নদ ও নদী
সায়াহ্ন
দেবীর দেশের মেয়ে
নববোধন
অগ্রগামী
ঝড়ের সঙ্কেত
আলো আর আগুন

—চিত্র—

আগ্নেয়গিরি
রঙীন সুতো

—ছোটদের—

শুকনো পাতা
সত্যি বলছি
আমার কথাটি ফুরোলো
দুরাশার ডাক
ওপারের দূত

—প্রবন্ধ—

মনে মনে
পায়ে হাঁটা পথ

মুখবন্ধ

"আদি ও অকৃত্রিম" বইটি নতুন, কিন্তু এর গল্পগুলি নতুন নয়। তারুণ্যের প্রথম পর্যায়ে যখন গল্পের উপাদান-বৈচিত্র্য নিয়ে পরীক্ষা বসেছি, সেইকালে অর্থাৎ কুড়ি বাইশ বছর আগে এগুলি লেখা। গল্প সাজাবার কৌশল খুঁজেছি তখন, মৌলিকতার দিকে চোখ পড়েনি। ফলে কোনো কোনো অগ্রবর্তী লেখকের নিঃশব্দ প্রভাব আমার গল্পে এসে জড়িয়ে গেছে। মাটির উপরতলায় যে ইমারত দাঁড়িয়ে ওঠে, মাটির নীচে থাকে তা'র ভিত্তি রচনার মালমশলা। এই কাহিনীগুলি তারই অনুরূপ। তখনকার কালের ছোট বড় সাময়িক পত্রের জঞ্জালে এগুলি চাপা পড়েছিল, এতকাল পরে শ্রীমান গো[illegible] সেগুলি উদ্ধার ক'রে তুললেন। অক্ষম রচনাকে পুস্তকাকারে [illegible] ধরায় অগৌরব নেই—কারণ এর সাহিত্য-মূল্য স্বল্প হ'লেও ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য কিছু মেলে। অন্তত, মনোযোগী পাঠক চিনতে পারেন, পিছনের কতদূর পথ পেরিয়ে আজ কোথায় এসে পৌঁছেছি। এই মনোভাব সব লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক।

চৈত্র, ১৩৫১ প্রবোধকুমার সা[illegible]



আদি ও অকৃত্রিম

পুরানো কথা

কতদিন হইতে যে সে-বাড়ী খালি পড়িয়া আছে তাহা কেহ জানে না, কখনও কেহ যে এই জীর্ণ আচ্ছাদনটির তলায় সুখ দুঃখের পসরা মাথায় করিয়া বাস করিয়াছিল তাহাও কেহ বলিতে পারে না। গ্রীষ্মের প্রখর দীপ্তি, বর্ষার প্লাবন, হেমন্তের হিম আবার বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার শিহরণে সেটা এখনও একেবারে ধ্বসিয়া যায় নাই বটে তবে সম্মুখের ক্ষুদ্র পুরাতন জানালাহীন নীচু ঘরগুলায়, ছাদের ভিত্তিতে প্রায় আধ হাত পরিমাণ ফাটল ধরিয়াছে এবং তাহারই ফাঁকে রাজ্যের বাদুড় চামচিকা প্যাঁচা সকলেই বহুদিন হইতে আপন আপন কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। বাড়ীখানার সুমুখে বিঘা-দুই পোড়ো জমি; তাহারই স্থানে স্থানে গোটা-কয়েক পত্রহীন শুষ্ক নারিকেল গাছ প্রাণহীন দেহ লইয়া কতদিন হইতে আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর পিছন দিকে একটা ডোবা, পানায় ভরা; তাহার অব্যবহার্য্য জলটুকুও কোন্ তলায় পড়িয়া আছে, বৃষ্টিতেও তাহার পরিমাণ বাড়াইতে পারে না, মাটিতে শুষিয়া লইলেই যেন বাঁচে।

জনহীন স্তব্ধ পুরী দিবায় নিশায় খাঁ খাঁ করে; ঝিঁ ঝিঁ কাঁদে; শেয়ালরাও চার প্রহরে চারবার কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়।

সেদিন সকাল-বেলায় কিন্তু পাড়ার দুই একজন লোক সবিস্ময়ে দেখিল, দুই তিনখানা জীর্ণ কাঁথা কার্ণিশটার উপর ঝুলিতেছে। একটি মেয়েকেও নাকি ঘুরিতে ফিরিতে দেখা গিয়াছে।

কথাটা সত্যই। গত কাল সন্ধ্যাবেলা মনোরমা এখানে আসিয়াছে। সঙ্গে স্বামী মন্মথ ও রুগ্ন আট বছরের মেয়েটা। এতদি[illegible] কোথায় একটা গ্রামে মন্মথর দূর সম্পর্কের এক [illegible] ছিলেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ার মহামারীতে সেখানে আর [illegible] কিছুতেই চলিল না। আজ কয়দিন হইল মনোরমার কোলের একটি [illegible] সেই রাক্ষস খাইয়া ফেলিয়াছে।

বিবাহের পর এই প্রথম মনোরমা স্বামীর ভিটায় পা দিল। সেই তের বছর বয়সের বউ—ঘোমটার ভিতর হইতে তাকাইতে যখন ভয় করিত, তখন হইতে এই বাড়ীর কথা সে শুনিয়া আসিতেছে। শ্বশুর শাশুড়ী, পিসতুত মাসতুত ননদ ইত্যাদিতে এ বাড়ীখানি সরগরম ছিল, কিন্তু আজ আর কেউ নাই। কেহ মরিয়াছে, কেহ শহরে রোজগারের উদ্দেশ্যে চলিয়া গিয়াছে, কেহ ম্যালেরিয়ায় এবং অজন্মায় গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীটির যৌবনবেলায় একটি প্রকাণ্ড পরিবার যে ইহাকে দলিত মথিত করিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার অনেক চিহ্নই বর্ত্তমান। উপরে উঠিবার সিঁড়িগুলা ক্ষয় হইয়া সমান হইয়া গিয়াছে, কূয়ার সুমুখে চাতালটার শুধু চিহ্নই আছে আর কিছুই নাই। বড় দালানটার যেখানে বছর বছর দুর্গা পূজা হইত, তাহাতে এমনি তিনচারিটা ফাটল ধরিয়াছে যে তাহার ভিতর দিয়া ঘোষপাড়া বারোয়ারীতলাটার সমস্তই দেখা যায়। এমনি আরও কত কি।

সকালবেলায় মনোরমা উঠিয়া ভাঙ্গা মাটির কলসীটা করিয়া ডোবা হইতে জল বহিয়া আনিয়া প্রায় আধখানা বাড়ী ধুইয়া ফেলিল। ঘরের ভিতর দালানের খাঁজে খাঁজে অশথ গাছের চারা ও নানারূপ গাছ-গাছড়া গজাইয়া ছিল, যতটা পারিল, সেগুলাকে তুলিয়া ফেলিয়া

পরিষ্কার করিল। বাছিয়া বাছিয়া যে ঘরটা শুইবার জন্য তাহারা লইয়াছিল, তাহার উত্তর দিকের দেয়ালের উপরের কার্ণিশটা ধ্বসিয়া গিয়া ছাদের একখানা বরগা ঝুলিতেছিল, তাহা কখন্ পড়ে; তারই তলায় একরাশি সুরকি ও বালির চাপড়া জমা ছিল—সেগুলাকে সে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিল। এইরূপে ধীরে ধীরে কোনও রূপে কায়ক্লেশে ঘরখানিকে সে বাসের উপযুক্ত করিয়া লইল।

তারপর স্নান সারিয়া যখন সে মাথা মুছিতেছিল, একটা লোক অন্যমনস্ক ভাবে একখানা দা লইয়া সটান ভিতরে চলিয়া আসিতেছিল। মনোরমা মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া বিনয়কাতর কণ্ঠে বলিল, 'দয়া ক'রে আপনারা আর বাকী জানালা ক'টা কেটে নেবেন না, সবই ত পুড়িয়ে ফেলেছেন—'

লোকটা থতমত খাইয়া গেল। জরাজীর্ণ গৃহখানির স্তব্ধ নির্জ্জনতা অল্পমাত্র ভেদ করিতে পারিয়া নারী-কণ্ঠস্বর ভিজা তবলার মত ঢ্যাব ঢ্যাব করিয়া উঠিল। একটুমাত্র নীরব থাকিয়া লোকটা বলিল, 'আমরা ত এখান থেকে রোজই কাঠ কেটে নিয়ে যাই কেউ বারণ করে না, তুমি কে গা বাছা?'

মনোরমা সহসা উত্তর দিতে পারিল না, লোকটি পুনরায় বলিল, —তোমরা কি এখানে থাক্‌তে এলে?

—হ্যাঁ, কতদিন আর খালি পড়ে থাকবে, তাই এবার থাকতেই এলুম, কিন্তু আপনারা দয়া করে আর গরীবের কুঁড়েটুকুর বাঁধনগুলি কেটে নিয়ে যাবেন না, যদি কোনও দরকার থাকে ত শুধু হাতেই বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন,—শেষের কথাগুলি সে জোর দিয়াই বলিয়া গেল।

লোকটি অবাক, তবুও একটু বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল,—একি তোমাদেরই বাড়ী ?

—হ্যাঁ।

—তবে এতদিন ছিলে কোথায় বাড়ী খালি রেখে ?

—যাক্‌গে—সে আলোচনা পরেও হ'তে পারবে, আপনি এখন আসুন গে যান্‌ ; বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে রুগ্ন মেয়েটা ওয়াক্‌ ওয়াক্‌ করিতে করিতে সুমুখে আসিয়া পড়িয়া অনর্গল বমি করিতে লাগিল।

লোকটি আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

জল আনিয়া তাড়াতাড়ি-মনোরমা মেয়েটার মুখে চোখে দিতে লাগিল। কতকটা সুস্থ হইলে দেয়ালে হেলান দিয়া মেয়েটা বসিয়া রহিল। ম্যালেরিয়ায় তাহার চেহারা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, মাথায় স্বল্প চুলের নুড়িটা বহুদিন তেলজল না পড়িয়া একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখের কোণের হাড় দুইটা খোঁচার মত ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটা তত পরিমাণেই ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে,—ঠাহর না করিলে আর দেখা যায় না। ময়লা দাঁত দুপাটি অধরোষ্ঠকে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কঙ্কালসার দেহটার রং হইয়া গিয়াছে হলদে মত, তাহার উপর মাঝে মাঝে এক পরদা পুরু ময়লা পড়িয়াছে। কে বলিবে এ মায়ের এ মেয়ে। ঘরের ভিতর হইতে বিকৃত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিলেন, শুনচ ?

—দাঁড়াও যাচ্ছি,—বলিয়া মনোরমা দালানের এক কোণ হইতে এক বাটি সাগু সিদ্ধ আনিয়া বলিল, অনেকক্ষণ খাস্‌নি একটু খেয়ে ফেল বিম্‌লি—

বিমলা নাকে কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, না খাব না, ফেলে দাওগে—বলিয়া সে পিছন ফিরিয়া বসিল।

ম্যালেরিয়া রোগী বিষ খাইতে চায়, কিন্তু সাগু খাইতে চায় না। সুতরাং কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া মনোরমা বলিল, —খেয়ে ফেল' লক্ষ্মী মা আমার, আর কিছু ত নেই!

মেয়ে তেমনি ভাবেই বলিল, রোজ সাবু, রোজ সাবু, যখন তখন সাবু, দুটি ভাত দিতে পার না কেন? বলিয়া অশ্রুসজল চক্ষে মায়ের পানে একবার চাহিয়া কম্পিত ক্ষীণ হস্তে বাটিটা লইয়া একটু একটু করিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়ের তিরস্কারে মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। তাহারই পেটের এমন একটা কুহকী সন্তান শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলিবার পূর্ব্বে মরণার্ত্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া একদিন বলিয়াছিল—দুটি ভাত দিতে পার না কেন?—কিন্তু সে দুটি ভাত দিতে পারে নাই এবং তাহার দারিদ্র্য-নিপীড়িত মাতৃহৃদয়ের যে অব্যক্ত মর্ম্মান্তিক জ্বালা সেদিন মরণোন্মুখ সন্তানের তিরস্কারে চুপ করিয়া গিয়াছিল, আজ তাহার চক্ষের সুমুখে যেন সেই ভয়ঙ্করী নিশীথিনীটি মূর্ত্ত হইয়া জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

মন্মথ ভিতর হইতে পুনরায় ডাকিলেন, শুনতে পাচ্ছ না, কানের মাথা খেলে?

—যাই, বলিয়া ধড়মর করিয়া উঠিয়া চক্ষের জলের ফোঁটা দুইটা তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া সে ভিতরে গিয়া দেখিল, মন্মথ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, ঠোঁটের কস্ বহিয়া রক্তের ধারাটি পড়িয়া জীর্ণ কাঁথাখানি ভিজিয়া গিয়াছে। এ আজ নূতন নয়, প্রায় ছয় সাত বছর হইল মন্মথ হাঁপানিতে ভুগিতেছেন। আগে কাশির সঙ্গে সর্দ্দি উঠিত,

আজকাল রক্ত উঠে। আগে তিনি নিজেই নিজের সেবা করিতেন, আজকাল আর পারেন না, হাত পা অসাড় হইয়া গিয়াছে।

তাড়াতাড়ি মুখখানি মুছাইয়া দিয়া মনোরমা আস্তে আস্তে আঁচল দিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিল। মন্মথ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, সেই বড়ি আছে একটা দাও, নইলে কম পড়বে না। মনোরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া কুলুঙ্গীর উপর হইতে একটি কাপড়ের পুঁটলি খুলিয়া কাগজের কৌটা করা কতকগুলা বড়ি হইতে একটি বাহির করিয়া আনিল। কোলের ছেলেটা যখন মরে, তারই গলার শেষ সোনার মাদুলিটি বেচিয়া এই হাঁপানির ঔষধটি সে স্বামীর জন্য কিনিয়া দিয়া ছিল। এমন হইলেও পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা ভালই ছিল। মন্মথ কোথায় রেলে বহুদিন চাকরী করিতেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের বধূটি একটি ছেলে রাখিয়া মারা যায়। ছেলেটি মামার বাড়ীতে থাকিয়া বড় হয়, ওদিকে ছন্নছাড়া পিতা মদ খাইয়া যথেচ্ছাচার করিতে শুরু করেন। ছেলে অনেকদিন এইরূপ সহ্য করিয়া বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে, ফলে বাপ তাহাকে 'ত্যজ্য পুত্র' করিয়া তাড়াইয়া দেন্। কিছুদিন পরে দূরসম্পর্কীয় বোনের অনুরোধে মন্মথ দ্বিতীয় পক্ষে মনোরমাকে বিবাহ করেন। পরে মনোরমা শুনিয়াছিল, তাহার সতীনপোটি শহরে কোন একটি ঠিকানায় থাকিয়া আফিসে চাকরী করিতেছে।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বাধা না মানিয়া মন্মথ দিন দিন মদের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। শেষে পরিমাণ—'পরিণামে' দাঁড়াইল। হাঁপানি হইল। কবিরাজ বলিয়াছে, বেশী বয়সের অসুখ, এ আর সারবে না—

বড়ি খাওয়াইয়া মনোরমা বলিল, এবেলা খাবে কি ?

কষ্টে ঘাড় তুলিয়া মন্মথ বলিলেন, খাবার কিছু জোগাড় আছে বুঝি ?

—না নেই কিছু, কিন্তু খাওয়া ত দরকার ?

—খাওয়া দরকার ? হ্যাঁ যে ক'টি চিঁড়ে ছিল তা আমি খেয়েছি, সাবুটুকুও বাপ বেটিতে খেয়েছি,—কিন্তু তুমি দুদিন কিছু খাওনি—খাওয়া দরকার এখন তোমারই—

মনোরমা বলিল, আমি দুদিন খাইনি, আমি মেয়েমানুষ, আমার এতখানি শরীর, অসুখের চিহ্নটি নেই—

—অসুখ থাকলেই ত ক্ষিধে থাকে না, কিন্তু সুস্থ শরীরেই যে খাওয়ার দরকারটি বেশী—বলিয়া মৃদু হাসিতে গিয়াই ভিতর হইতে একটা ভীষণ কাশির বেগে তিনি হাঁ করিয়া উঠিলেন। মনোরমা চলিয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বামীর বুকের দুইটা পাশ শক্ত করিয়া জাপটাইয়া ধরিল, পাছে কাশির চাড়ে কঙ্কালসার দেহের হাড় পাঁজরাগুলি পাতলা মাংস ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। একটানে দশবার কি পনেরবার কাশিয়া তবে একটু সুস্থ হইলে মনোরমা আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল।

সাগুর বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বিমলা কখন্ যে বমি করিয়া ভাসাইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই। আসিয়া দেখে সে দেয়ালে হেলান দিয়া ঝিমাইতেছে, সুমুখের কাপড়টা বমিতে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাকে সুস্থ করিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিয়া সে বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে! মেয়েটার এই মরণাপন্ন অবস্থা, মন্মথরও তাই—যেদিন যায় সেই দিনই ভাল। রেলের পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া মন্মথ কিছু মাসহারা পাইতেন, কিন্তু এমাসের প্রথমেই

নানারূপে তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। ঠিকানা সন্ধান করিয়া মনোরমা সতীনপোকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল কিন্তু উত্তর আসে নাই।

বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস তপ্ত ঘূর্ণীবায়ুর মত তাহার বুক চিরিয়া বাহির হইয়া গেল। সুমুখের খিড়কী দরজার নিকটে একটা তাল-গাছের পাতায় বাতাস লাগিয়া সিরসির করিতেছিল। তাহারই তলায় যে ঘরটায় তাহার শাশুড়ী থাকিতেন সেটার ছাদ ধ্বসিয়া গিয়াছে, ভিতরের সেই স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশির পাশে একটা কালো বিড়াল কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। তৃষ্ণায় মনোরমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গিয়া সে ডোবায় নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া খানিক জল খাইল, এবং আস্তে আস্তে মুখে ও মাথায় জলের হাত বুলাইতে লাগিল।

২

পড়ো বাড়ীটায় লোক আসিয়াছে এটা যখন সে অঞ্চলে রাষ্ট্র হইয়া গেল, তখন এ খবরটি সান্ধ্যসমিতিতে পৌছাইতে একটুও বিলম্ব হইল না। পাড়ার কতকগুলি যুবক লইয়া বছরখানেক পূর্ব্বে এই সান্ধ্যসমিতি ভূমিষ্ঠ হয়। খগেনবাবু এর হর্ত্তাকর্ত্তা। চাল, পয়সা যাহা কিছু লোকের নিকট হইতে আদায় হয় সবই তাঁর বাড়ীতে গিয়া জমে। তাঁহার দুইটি ছেলে বেকার বসিয়াছিল, সমিতির চাঁদা আদায় করিয়া দেয় বলিয়া তিনি তাঁহাদের কিছু কিছু হাতখরচ দেন। চালগুলি গরীব দুঃখীদের ভিতর বিলি হয় কিনা এ খবর কেহ রাখেনা। কিছুদিন হইতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে এখানে চার পাঁচটি চরকাও বসিয়াছে। চাঁদার পয়সা হইতে চরকা ও তূলা কেনা হয়; শুধু তাই নয়, গোটা কয়েক বেকার ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার হুজুক

লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যা সূতা কাটে তাহাই তাঁতীর বাড়ী বুনাইয়া লইয়া খগেনবাবুর পরিবারের কাপড়ের খরচ বাঁচিয়া যায়।

আজ সন্ধ্যাবেলা এখানে প্রবল তাসের আড্ডা বসিয়াছিল, রোজই বসে। মাঝে মাঝে ইহাদের সহর্ষ এবং সক্রোধ চীৎকার অনেক দূর অবধি শুনা যাইতেছিল। আশু ছেলেটা একটু ভালমানুষ, সরকারী হিসাবের আফিসে সে চাকরী করে। তাহাদের ডাকিয়া সে বলিল, ওহে রাত্তির হ'ল, তাসগুলো না ছিঁড়ে কি উঠবে না? তাহার কথা কেহ শুনিল না, শেষে সে আস্তে আস্তে হরিদাসের পকেট হইতে দুইটি বিড়ি তুলিয়া লইয়া একটি ধরাইল, আর একটি রাখিয়া দিল, রাত্রে দরকার লাগিবে। পরে বিড়ি টানিতে টানিতে বলিল, ওহে জমিদার, মাইনে পেতে এখনও দেরি আছে, একটা টাকা ধার দাও-না—

জমিদার ওরফে মহিম মুখ ফিরাইয়া বলিল, টাকা কি হবে, ডেলি প্যাসেঞ্জারের টিকিট ত কেনাই আছে—

—তা বললে কি হয়, টিফিনের সময় পেটের ভেতরটা যে জ্বলেপুড়ে যায়, না খাই এক পয়সার সরবৎ না খাই এক খিলি পান। আজ চারদিন ধরে পানউলি মাগির সুমুখ দিয়ে নাকে রুমাল বেঁধে আনাগোনা করছি, ধরতে পারলে চুণখয়ের মাখিয়ে ছেড়ে দেবে—দাও, দাও একটা টাকা, জমিদার মানুষ তোমরা, রাজা লোক,—টাকা একটা ছাড়—

মহিম মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন, বাড়ী থেকে তুই হাতখরচ পাস্‌নে?

—হাঁ, হাতখরচ! আটতিরিশটি টাকা মাইনে পাই, তার মধ্যে তিন টাকা যায় মান্‌থলি টিকিটে, তারপর মাসকাবারি দেনা শোধ করে যখন বাড়ী যাই, তখন হাতে থাকে আড়াই টাকা—তারপর বাড়ীতে সারা মাসের খরচ, বল ত চাঁদ,—কোত্থেকে হাতখরচ পাব?

ওধারে এতক্ষণ মুহুর্মুহু গর্জ্জন উঠিতেছিল, এক ছক্কা খাইতে দুইটি খেলোয়াড়ের মধ্যে বচসা শুরু হইয়াছিল। খানিক পরে গোল একটু থামিলে হরিদাস ধীরে সুস্থে একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, ওহে জমিদার, তোমার চাঁদা কই ? সাতমাস হ'ল যে,—

মহিম হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, হাতে এখন পয়সা নেই ভাই, সত্যি বলছি।

তুমি জমিদার, তোমার হাতে পয়সা নেই ? এ হ'তে পারে না !

বলাই ছেলেটা ঠোঁটকাটা, সে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, বড়লোকের পয়সা না থাকা আজকাল ফ্যাশন—

খগেনবাবু প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ কিসে কি হইয়া গেল। সকলের হাতের জ্বলন্ত বিড়িগুলা চট্‌ করিয়া হাতের চেটোর আড়ালে চলিয়া গেল। খগেনবাবুর বড়ছেলে ঘোঁতা এতক্ষণ অত্যন্ত আরামে বিড়িতে টান দিতেছিল, একমুখ ধোঁয়া লইয়া সে আর ছাড়িতে পারিল না; চোখমুখ রক্তবর্ণ করিয়া হঠাৎ জানলার ধারে উঠিয়া গেল। ছোট ছেলে প্যাতাই মাদুরের উপর তবলার বোল ফুটাইতেছিল, হঠাৎ একখানা হিসাবের খাতা টানিয়া উল্টা দিকেই পড়িতে লাগিয়া গেল। কৈলাস অনেকক্ষণ হইতে উবুড় হইয়া শুইয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ বুজিয়া 'মোটি মোটি লিটিয়া' গান ধরিয়াছিল, খগেনবাবুর সাড়া পাইয়া ঝপ করিয়া তাহার গান থামিয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে উঠিয়া-বলিল, বাইরে থেকে আসি—বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

খগেনবাবু তাহার পথের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, ওর চাঁদা বাকি আছে বুঝি ?

হরিদাস বলিল, কৈলাসের ? হ্যাঁ, তিন মাসের বাকি—

খগেনবাবু মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বললেন, ছিঃ তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে, কথার ঠিক রাখতে পার না। আর খাতা খুলে দেখ আমাদের দীনুমুচির বস্তির মেম্বারদের রেগুলারিটি—তারা এক মাসের আগাম দিয়ে রাখে,—মহিম, তুমিও দাওনি ত ?

—দু' এক দিনের মধ্যে দিয়ে দেবো—

বলাই বলিল, আপনারও দু মাসের বাকি খুড়োমশাই—

—ওঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, গেল কাল দেবার কথা ছিল বটে, আর পাঁচ ঝঞ্ঝাটে কি মনে থাকে বাপু ? আচ্ছা চাঁদার কথা থাক্, ওরে ও রহিম, ছোঁড়া গেল কোথায় ? এক ছিলিম তামাক দে হতভাগা—

প্যাতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, হঠাৎ বলিল, কালই বা দেবে কোত্থেকে বাবা ? পয়সার জন্যে ত কাল—

—আঃ আমি দেখি, ছোঁড়া কোথায় গেল, বলিয়া বাহিরে আসিয়া খগেনবাবু বলিতে লাগিলেন, এই যে এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, বেটা কেবল দিন রাত পড়ে পড়ে ঘুমুবে, তামাক সাজ হতভাগা। বলিয়া পুনরায় ভিতরে আসিয়া বলিলেন, এই প্যাতাই, ওরে ওই ঘোঁতা, টুলচিস্—যা বাড়ী যা—দিন রাত ইয়ারকি মারবে—কাল থেকে প্যাতাই আর ক্লাবে আসবিনে, না পড়া না:শুনো—য়া বেরো। তাহারা বাহির হইয়া গেল।

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য খগেনবাবু রহিমকে এখানকার চাকর রাখিয়াছেন। বছর ষোল তার বয়স, সে 'ক্লাব রুম' প্রত্যহ পরিষ্কার করে, আলো জ্বালে, তামাক সাজে। দিনের বেলা খগেনবাবুর বাড়ীতে খায়, রাত্রিতে এখানে পড়িয়া থাকে। মাহিনা মাসে এক টাকা। তাহার সমস্ত খরচ, কাপড়-চোপড় বাদ—সমিতি বহন করে, কিন্তু

তাহার মাহিনার টাকাটি খগেনবাবুর নিকট জমিয়া বোধ করি, এতদিন বিশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মাহিনা চাহিলেই খগেনবাবু বলেন, কি চাই বল না, কিনে এনে দেবো—। সে কিছু বলে না, হাসিয়া সরিয়া যায়।

রহিম আসিয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল। খগেনবাবু একবার কাশিয়া লইয়া বলিলেন, পোড়ো বাড়ীটায় লোক এসেছে শুনেছ ত?

সকলে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—মহিম দেখে এসেছে—

—শুধু তাই নয়, শোন বলি, আমি কাল সকালে ও বাড়ীতে কেউ নেই বলেই ঢুকছিলুম, একটা সোন্দরপানা মেয়ে আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে—

'সোন্দরপনা' মেয়েটিকে মহিম চকিতের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিল, তাই সবিস্ময়ে বলিল, আপনি গিছলেন কেন, খুড়োমশাই?

—কেন, লোক বেড়াতে যায় না?

হরিদাস কহিল, ওদের সমিতির 'মেম্বর' করে নিলে হয় না?

খগেনবাবু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, সেই জন্যই ত গিছলুম, আমার পোড়া কপাল। ওরে ও রহিম, তুই কাল যাবি—

রহিম মুখ ফিরাইল।

—গিয়ে বলবি, এ গ্রামে থাকতে হ'লে সমিতির মেম্বর হতে হবে—গরীব বলে ছেড়ে দেওয়া হবে না—বুঝলি?

রহিম তামাকের হুঁকাটা হাতে দিয়া বলিল, সেকি কথা কর্ত্তা, তারা যে বড্ড গরীব—

হুঁকায় একটা টান দিয়া খগেনবাবু চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, তুই থাম হতভাগা, ছোট মুখে বড় কথা, ফোপল্ দালালি করলে তাড়িয়ে দেবো—

মহিম আস্তে আস্তে বলিল, তারা গরীব, তুই কি করে জান্‌লি ?

রহিম উৎসাহ পাইয়া বলিল, তারা খুব গরীব জমিদারবাবু, খেতেও পায় না, আমি যে তেনাদের বাড়ী আজ গিছলুম—

—কেন গিছলি ?

—হোই সেথায় পুকুর ধারে বসে 'সেই দিদি' কাঁদ্‌ছিল, আমি যেতেই বলে, মেয়ের ম্যালোয়ারি হইছে ; আমার চাচা দাবাই জানে কিনা, তাই দিয়ে এনু।—সকলে নীরব। খগেনবাবু মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, বেটা দাতাকর্ণ এসেছে। রহিম আর কিছু বলিল না, বাহিরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উপরে আকাশটা তারায় ছাইয়া গিয়াছে, তাহাদেরই গায়ে কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের একটু ঘোলাটে আভা পড়িয়াছে। সম্মুখে ঐ মাঠটার ওপাশে কয়েকটা দেবদারু গাছ বাতাসের দোলনায় অন্ধকারের অস্পষ্টতায় ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল। রহিম মেটে দেয়ালটায় হেলান দিয়া তন্দ্রালু দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। মানব-লোকের চিরন্তন অভাবের ব্যথাতুর হাসিটুকু তাহার মুখে লাগিয়াই রহিল।

কতক্ষণ বাদে গায়ে একটা আঙ্গুলের টিপ পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল, মুখ তুলিয়া বলিল, কে জমিদারবাবু—কি বলচ ?

মহিম বলিল, তুই এখানে বসে আছিস, কেউ দেখতে পায়নি, রাত হয়েছে, সকলে দোরে চাবি দিয়ে গেছে—

—তুমি যাওনি ?

—না, বলিয়া রহিম একটু থামিল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, নিকটে দূরে কেহ নাই, অন্ধকার রাত্রিতে ঝিল্লীর আর্ত্তনাদ ভেদ করিয়া চুবড়িপোতার চটকল হইতে ঘড়ির অস্পষ্ট ঢং ঢং শব্দ কাঁপিয়া কাঁপিয়া

বাজিতেছিল। মহিম সেই দিকে একবার চাহিয়া চট্ করিয়া বলিল, —তুই আর যাবিনে সেখানে, রহিম ?

—কোথায় বাবু ?

—সেই তোর দিদির বাড়ী ?

—ওঃ হ্যাঁ—কাল আবার যাব দাদাবাবু—

—আজই চল্না, হয়ত তারা উপোস করে আছে, চল রহিম, তোর পুণ্যি হবে—

রহিম আবার তেমনি করিয়া হাসিল, বলিল, তা উপোস করেই আছে বাবু—তারা কিছু খেতে পায়নি—কিন্তু এই রাতে গিয়ে কি করতি পারব বাবু তাই ভাবচি—

—তা হক চল্ না দেখি—তুই বললি তাদের আবার অসুখ, গরীব লোকের অসুখ হলে, খেতে না পেলে কি দেখা উচিত নয়, রহিম ?

রহিম মৃদু হাসিয়া বলিল, চল যাই—উঃ কি মশা এখানে বাবু, এই পচা খানা, নর্দ্দমা পাঁকে ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে—বলিয়া নিজের হাত পা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আমার গায়ের চাদরটা নিবি ?—একটু একটু শীত পড়েছে—

—নাঃ, মশায় যে কামড় দিয়েছে, গায়ে জ্বালা ধরে গেছে—বলিয়া শুধু গায়েই সে চলিতে লাগিল।

ভিতরে ঢুকিতে বাধা নাই। বড় দেউড়ীর পাল্লা দুইটা কবে কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। সুমুখ দিকে মহিমের কিছুই নজর পড়িল না, কেবল একটা শেয়াল অন্ধকারে আসিয়া যে দরজাটার ফাঁক দিয়া আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল, সেইখানে এদিকে ওদিকে উঁকি মারিতেছিল, ইহাদের দেখিয়া পলাইয়া গেল।

রহিম সেইদিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, ওই ঘরে দিদি আছে, ডাকব বাবু?

মহিম থতমত খাইয়া গেল। তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করিতেছিল। ভয়ে নয়, মানুষের একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায়। সে যে ঠিক এই অন্ধকার রাত্রে অসময়ে পরের সাহায্য করিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে তাহাই ভাবিয়া একটা আত্ম-অবিশ্বাসের অজ্ঞাত শিহরণে থমকাইয়া দাঁড়াইল।

রহিম তাহার মুখের অবস্থা অন্ধকারে লক্ষ্য করিতে পারিল না, পুনরায় বলিল, বাবু ডাকব? কিন্তু ডাকিতে হইল না। বন্ধ দরজাটি খুট্ করিয়া খুলিয়া গেল। একটি মিটমিটে কেরোসিনের ডিবে ও একহাতে একখানা ময়লা কাঁথা লইয়া মনোরমা বাহির হইতেছিল। রহিম সেইখান হইতে ডাকিল, দিদি?

—কে রে—বলিয়া মনোরমা কাঁথাখানা ফেলিয়া আলোটা তুলিয়া ধরিল। মহিম স্পষ্ট দেখিল দুইটি চোখে জলের ধারা চকচক করিতেছে। কাল একবার সে ইহাকে দেখিয়াছিল, আজ ভাল করিয়া দেখিল, মুখখানি মাধুর্য্যময়, বয়স আন্দাজ তেইশ কি চব্বিশ হইবে।

—আমি, বলিয়া রহিম অগ্রসর হইয়া গেল।

গাঢ়স্বরে মনোরমা বলিল, এত রাতে আবার কেন এসেছ ভাই, বলিয়া হাত দিয়া চোখের জলটা মুছিয়া বলিল, তোমার জামাইবাবুকে বোধ হয় আর বাঁচাতে পারলুম না রহিম—বলিতে বলিতে সে আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রহিম তাড়াতাড়ি বলিল, আমার সঙ্গে ইনি এসেছেন দিদি—ডাক্তার আনবেন কি? এঁরা খুব বড় লোক, পয়সা নেবেন না—

—কে এসেছেন ? বলিয়া বিস্মিতভাবে মনোরমা মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিল।

মহিম এইবার সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনি রুগী নিয়ে দুদিন রয়েছেন, আমাদের খবর দেননি কেন, আমরা ডাক্তার পাঠিয়ে দিতুম—

মাথা নীচু করিয়া মনোরমা বলিল, আমরা ত আপনাদের চিনিনি, আপনারাও চেনেন না, সুতরাং—

মহিম বলিল, কিন্তু বিপদের সময় চিনিনি বলে অভিমান করা ত সাজে না, মানুষের ওপর মানুষের চিরকালের দাবীটুকু ত আছে। শোন্ রহিম—তুই চট্ করে আমাদের বাড়ী গিয়ে সতীশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়, বারটা বাজেনি—এখনও আমাদের বৈঠকখানায় তিনি বসে আছেন—যা। রহিম ঘাড় নাড়িয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

মহিম একটু থামিয়া বলিল, আপনারা কোথায় ছিলেন ?

—বহরমপুরের একটা গ্রামে—

—ওঃ পাগলার দেশ—ম্যালেরিয়ার আড্ডা, আপনার স্বামীর ম্যালেরিয়া ত ?

—না, হাঁপানি, ম্যালেরিয়ায় আমার মেয়েটি ভুগছে—

—আপনার মেয়ে ! ওঃ তা ডাক্তার সারিয়ে দেবে—চলুন আপনার রুগীদের দেখি—বলিয়া অলক্ষ্যে একবার তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া মহিম ঘরের ভিতর ঢুকিল।

চক্ষের অশ্রু আর বাধা মানিল না, ভিতর হইতে সে যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। রোগী মরিতে বসিয়াছে সে ত বটেই, কিন্তু আজ বিশ্বের সমস্ত করুণাটুকু হাতে করিয়া এক অনাথিনীকে যে এই যুবকটি ঘোর নিশারাতে কেবল শুধু সাহায্য করিতেই ছুটিয়া আসিয়াছে,

ইহারই জন্মে মনে মনে মনোরমা বারংবার ঈশ্বরকে প্রণাম করিল এবং অপলক দৃষ্টিতে একবার যুবকটীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বুঝিল, ইহারা তাহাদেরই একজন, যারা চিরদিন গরীব দুঃখীদের আলেয়ার আলো দেখাইতে পারে।

একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর, ততোধিক জীর্ণ একখানি কাঁথাতে মন্মথ শুইয়া টানিয়া নিশ্বাস লইতেছিল। মহিম তাহারই এক পাশে গিয়া বসিল। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা টিনের বাক্স, দুই তিনটা বোতল, একটি লাঠি, একটা পোড়া কলাইয়ের বাটি, আর কিছু নাই। ওধারে একখানা ময়লা লেপের উপর বিমলা চোখ বুজিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল। কেরোসিনের ডিবের শিস্ উঠিয়া এবং ভিজা মাটির দুর্গন্ধে ঘরটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

চুপ করিয়া থাকা যায় না। মহিম বলিল, আপনাদের রান্নাবাড়াও হচ্চে না বোধ হয় ?

—হয়েছে, ওই রহিম কোত্থেকে পয়সা দিয়ে চাল ডাল এনে দিয়েছিল—ছেলেটি বড় ভাল, মুসমান বলেই সেই জন্মে—। আমার অভাবের ব্যথা রহিমই প্রথমে বুঝেছিল। কাল একটি লোক এসেছিলেন, কিন্তু তিনি—

মহিম বলিল, হ্যাঁ—তিনি আমাদের সমিতির খগেনবাবু, তাঁকে নাকি আপনি অপমান করেচেন ?

আমি ? বলিয়া কাতর ম্লান চক্ষু দুটি মনোরমা মহিমের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, আমার এই অবস্থায় লোককে অপমান করেছি ?

মহিম সেই দৃষ্টিতে ব্যথা পাইল। সলজ্জ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, স্বার্থপর লোকের স্বার্থে আঘাত

লাগলে হয়ত অপমানই বোধ করে, তা করুক; কিন্তু আপনি ত জানেন চোখ-ফুটিয়ে দেওয়াটাই অপমান করা নয়!

বাহিরে রহিম ডাকিল, দিদি, ডাক্তারবাবু এসেছেন—

এইটুকু আমার সান্ত্বনা—বলিয়া মনোরমা আলোটা লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহিম বলিল, কি রকম দেখচেন, সতীশবাবু?

খুব বেড়ে গেছে,—

মনোরমা বলিল, আজ বিকেল থেকে আর সহ্য করতে পাচ্চেন না, দয়া করে একটু ভাল ওষুধ দেবেন—

মহিম বলিল, ভাল ওষুধই দেবেন, কেননা আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল হলে উনি নিশ্চয় রোগী হাতে রেখে চিকিৎসা করতেন—

বিমলাকে একবার নাড়াচাড়া করিয়া ডাক্তার বলিলেন, এ ত ম্যালেরিয়া দেখতে পাচ্ছি—বলিয়া মহিমকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলে মহিম বলিল, রোগটা হাঁপানি ত?

হ্যাঁ, কিন্তু অবস্থা বড় সুবিধা নয়,—

মনোরমা আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহিম বলিল, আজকে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই, আপনি রোগীর কাছে বসুনগে—

ওষুধ দেবেন না?

না, আজ ওষুধের দরকার নেই, কাল ওষুধ নিয়ে আমি নিজেই আসব—বলিয়া মহিম এক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর যা যা দরকার, আমি কাল পাঠিয়ে দেবো—আর রহিম, তুই এখানে থাক্—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অর্দ্ধচেতন দেহে মনোরমা বলিল, ঘরের ভেতরে এস ভাই রহিম—ডাক্তার কি বললেন ?

সেরে যাবে বললে দিদি—বলিয়া রহিম আস্তে আস্তে ঘরে উঠিয়া আসিল।

৩

ঔষধ খাইয়া রোগী একভাবেই রহিল, কিন্তু সেদিন বৈকালে আরও বাড়িয়া গেল। জেলা শহর হইতে সকাল বেলা মহিম বড় ডাক্তার আনিয়াছিল। তিনিও ওই কথা বলিয়া গেলেন, অবস্থা ভাল নয়। বিমলাও ভাল নাই, আগে উঠিতে পারিত, এখন শুইয়াই থাকে। পেটের পিলেটা বড় হইয়া পেটটা ধামার মতন হইয়া উঠিয়াছে, কখন ফাটে। মনোরমা নিরুপায় হইয়া বলিল, কি হবে মহিমবাবু ?

মহিম বলিল, আপনার কি ইচ্ছে বলুন, আমি এখুনি করতে প্রস্তুত আছি। আড়ালে গিয়া মনোরমা শুধু কাঁদিতে লাগিল।

রহিম সজলকণ্ঠে বলিল, এমন ডাক্তার কি নেই দাদাবাবু যে ভাল করতে পারে ?

মহিম এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, সে হচ্চে ভগবান, আর কেউ নয়।

রহিম চুপ করিয়া সরিয়া গেল।

মহিম দুই দিন বাড়ী যায় নাই, চাকর ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় একটু বাহির হইলেই সান্ধ্যসমিতির ছেলেরা তামাসা করে। মহিম প্রতিবাদ করিয়া কিছু বলিতেও পারে না, কাহারও সহিত দেখা হইলে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠে।

আজ মহিমের বাড়ী থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু একবারটি গিয়া চারটি ভাত খাইয়া আসিয়াছে, আর যায় নাই। তারপর এখানে

আসিয়া রোগীর পাশের অপ্রশস্ত অতি জীর্ণ ঘরখানায় বাড়ীর চাকর দিয়া একটা বিছানা আনিয়া পাতিয়াছে। সন্ধ্যার পর মনোরমা বলিল, কই আপনি গেলেন না, যাবেন বলেছিলেন?

মহিম বলিল, চলে যাওয়াটাই কি এত জরুরী, আর আপনার বিপদের অবস্থাটা কি এতই তুচ্ছ? অবশ্য আমায় যেতে বল্‌লেই—

—ছিঃ ওকথা বলবেন না, আপনার এ উপকারের দাম আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। কিন্তু এ ঘরে আপনি কি থাকতে পারবেন? বলিয়া ঘরখানার ভিতর একবার উঁকি দিয়া বলিল, বড় লোকের চিহ্নটুকু কিন্তু আছেই!

সবিস্ময়ে মহিম বলিল, কি রকম?

ঐ বিছানাটি, পরিষ্কার ধপধপে—ওই যা বিম্‌লি বুঝি বমি করছে—বলিয়া মনোরমা আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আবার বাহিরে আসিয়া মনোরমা বলিল, এবেলা কি খাবেন?

মহিম বলিল, বেলা আর নেই, রাত পুইয়ে এল—

রান্নাবান্না ত করিনি—

সে কথা আমিও জানি, আর তার উপায়ও করে রেখেছি, এখন যদি অনুগ্রহ করে—

অনুগ্রহ! কি করেচেন?

আমি বাড়ী থেকে খাবার আনিয়েছি, কিন্তু আপনি কি খাবেন? আমরা দু'জনেই স্বজাতি এবং পর ভাবিনে বলেই একথা বললুম।

একটা প্যাঁচা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল, তার পর সব নীরব। সম্মুখে দূরে জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। মনোরমার শিথিল দৃষ্টি যেন চিরকালের

জন্য অবসর চাহিল, সম্মুখের অনন্ত পৃথিবী যেন মরণের মহাক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িতেছিল, এবং তাহারও অন্তর জলপ্লাবনের তরঙ্গরাশির ন্যায় ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া উন্মত্ত আকর্ষণে তাহাকে টানিতেছিল। সে মাথা হেঁট করিল।

মহিম একটু হাসিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার ইচ্ছে নেই বুঝি?

আপনি খান্, বলিয়া মনোরমা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে সে উঠিল কিন্তু খাইল না, আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছে। আশপাশের আবর্জ্জনা এবং মাটির অসহ্য দুর্গন্ধে তাহার মাথার যন্ত্রণা হইতেছিল। পরণের কাপড়খানায় বিমলা বমি করিয়া দিয়াছে, তাহাতেও দুর্গন্ধ। কিন্তু আপাতঃ প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই দেখিয়া সে ডিবেটা চৌকাঠে রাখিয়া আসিয়া একটা ঢিপির উপর বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ জানি না, বোধহয় অনেকক্ষণ হইবে, সেইখানেই বসিয়া রহিল, সহসা পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া মাথা হেলাইয়া মহিম বলিল, আপনি এখানে বসে যে?

মনোরমা চমকিয়া উঠিল, বলিল, আপনি এখনও ঘুমোননি বুঝি?

না, একি, আপনি কাঁদচেন কেন? আলোতে সে মনোরমার মুখখানি লক্ষ্য করিতেছিল।

মনোরমাকে বলিল, আমার আর কেউ নাই মহিমবাবু!

মহিম বলিল, একজনের কেউ নেই, এ হ'তে পারে না!

মুখ তুলিয়া মনোরমা চাহিল। জলে তাহার চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে স্বল্প আলোকে দেখিতে পাইল শুধু দুইটা চক্ষু, আর কিছু না। ওই উজ্জ্বল চক্ষু দুইটার দৃষ্টি যেন

তাহার দেহের আবরণটা ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া অন্তরলোকের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। মনোরমা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল—শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে বলিল, আপনি কাল ত নিশ্চয় যাবেন ?

হ্যাঁ কালই যাব, আপনার কিছু—?

বেশ, আপনার উপকার আমি ভুলবনা। তবে আজ শুয়ে পড়ুনগে—ইত্যাদি দু' একটি অসংবদ্ধ কথা বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি আলোটা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ারের খিলটা আঁটিয়া দিল।

বিপদ কিন্তু আরও ঘনাইয়া আসিল। মন্মথর হাঁপানির টান আরও বাড়িয়া গিয়া 'শ্বাসে' পরিণত হইল; মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না, চোখ দুইটা ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে, পা ফুলিয়াছে। বিমলার অবস্থাও তদ্রূপ, সারাদিন চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। কখনও ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলে, দুটি ভাত দিতে পার না মা ?

মা বলে, অসুখ সেরে গেলে ভাত দেবো, মা—ডাক্তার বারণ করেছে—। বিমলা চুপ করে, পাণ্ডুর চোখ দুইটা দিয়া জলের ফোঁটা কাঁথায় পড়ে।

বৈকালে মহিম আসিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, কাল আমি যদি কোনও দোষ করে থাকি তবে মাপ করবেন।

মহিম বিস্মিত হইয়া বলিল, কই আমার ত মনে পড়ে না যে আপনি দোষ করেছেন— ?

মনোরমা সেখান হইতে সরিয়া গিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, রহিম কাল থেকে আসেনি কেন ?

সে এখানে আসে বলে খগেনবাবু তাকে মেরেছেন, হাতটা বোধ-হয় তার ভেঙ্গেই গিয়েছে।

শুনিয়া মনোরমা শিহরিয়া উঠিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, হাত ভেঙ্গে দিয়েছে ? কেন, আমি কি এতই ঘৃণার পাত্রী ? আপনিও তবে আর আসবেন না, মহিম বাবু।

ছিঃ ওকথা বলবেন না, আর যার কাছেই হ'ক, আমার কাছে আপনি ঘৃণার পাত্রী নন্ মোটেই।

মনোরমা সজল চক্ষে সরিয়া গেল। রহিমের ব্যথাটা তাহার বড় বাজিয়াছিল।

সে-রাত্রি আর কাটে না। নিঃশব্দে অন্ধকারের ভয়ার্ত্ত বিভীষিকা লইয়া মৃত্যু সেদিন এই ভগ্ন জীর্ণ গৃহখানিকে অধিকার করিয়া রহিল। মিটমিটে আলোকে তাহার সে মূর্ত্তি আরও ভরঙ্কর দেখাইতেছিল। মহিম চলিয়া গিয়াছে, সকাল না হইলে আর আসিবে না। মনোরমা কাত হইয়া বিছানার এক ধারে একখানা হাত মন্মথর গায়ের উপর রাখিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সে দৃষ্টিতে আর কিছু ছিল না, সারা সংসারটা যেন চেতনাহীন শিথিলতায় আপনার বাঁধনটি আল্‌গা করিয়া সম্মুখে ধীরে ধীরে লুটাইয়া পড়িতেছিল এবং তাহার এই তন্দ্রালু দৃষ্টির অন্তরালে সঙ্গোপনে মৃত্যু তাহার ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া কখন্ যে মন্মথর প্রাণটুকু চুরি করিয়া লইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সকাল বেলায় মহিম আসিয়া চার পাঁচটি লোক দ্বারা শবের সৎকার করিতে পাঠাইল। সে নিজে গেল না। মনোরমা বলিল, আমাকেও যেতে হবে কি ?

মহিম বলিল, সেখানে যাওয়া দুরূহ, আপনার চিন্তা নেই, ওরা নির্ব্বিঘ্নে কাজ শেষ করে ফিরে আসবে।

মনোরমা চুপ করিয়া চলিয়া চলিয়া গেল। চোখে তাহার অশ্রু নাই, থাকিলে প্লাবন বহিয়া যাইত।

বিমলা মায়ের দুঃখে কাঁদিবার চেষ্টা করিল, পারিল না; বিকৃত মুখে পাশ ফিরিয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক বেলায় ডোবার ধারে বসিয়া মনোরমা মাথার সিঁদুর মুছিল, হাতের কাচের চুড়ি ভাঙ্গিল, লোহা খুলিল, তারপর স্নান করিয়া শুচি হইল।

দিন চারেক পরে রহিম আসিল। দিদির অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মনোরমা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, কেঁদে কি হবে ভাই, আমি জানি এ দুঃখ আমার সইতে হবে, এর জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম, বলিয়া সে রহিমের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, কিন্তু আমার জন্যে তোমাকেও যে এই ভাঙ্গা হাতের ব্যথা সইতে হচ্ছে রহিম, এর সান্ত্বনা ত আর আমি খুঁজে পাচ্ছিনে ভাই?

রহিম এত কথা সব বুঝিতে পারিল না বটে, তবে এ স্নেহের স্পর্শে ভুলিয়া গেল, বলিল, তুমি আমায় ভালবাস দিদি?

তা কি তোমার বিশ্বাস হয় না রহিম, মুসলমান বলে কি তুমি আমার ভাই নও?

রহিম মাথা নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তার জন্যে নয় দিদি; আমরাও যে গরীব।

ভিতর হইতে বিমলা ক্ষীণ কণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বলিল, এই যে মা দুধ গরম করে দিই, বলিয়া বাটিটা আগুনের উপর বসাইয়া দিল।

মেয়েকে দুধ খাওয়াইয়া যখন বাহিরে আসিল, দেখিল হাতের

উপর মাথার ভর দিয়া মহিম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পিছন হইতে মনোরমা বলিল, রহিম কই ?

তাকে যেতে বললুম, নয় ত বেটা আবার হয়ত মার খেয়ে মরবে, বলিয়া মহিম একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

তা বেশ করেচেন, আপনিও এবার যাচ্ছেন বোধ হয়। তা যান্, আর থেকেই বা আপনার লাভ কি !

মহিম চাহিল, আবার সেই দৃষ্টি, কিন্তু এবার মনোরমা তাহা দেখিতে পাইল না, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। মহিম বলিল, লাভ ? আমি কি লাভের জন্যেই ছিলুম ?

না তা নয়, রুগী বাঁচলে আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার হ'ত। যারা সেবা করে তাদের সেইটুকুই লাভ। কিন্তু আপনার এ উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

কথার মধ্যে জড়তা বা দ্বিধার লেশমাত্র নাই। মহিম বিস্মিত হইল, পূর্ব্বে তাহার সকল কথাবার্ত্তার আড়ালে একটু কৃতজ্ঞতা থাকিত, কিন্তু ইহাতে তাহাও নাই। সে মুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিল তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, কিন্তু পরিশ্রমের পুরস্কার ত আছে, সেটা চাইলে ত পাপ নেই।

হঠাৎ মনোরমা মুখ ফিরাইল, তারপর বলিল, আপনি কি স্পষ্ট কথা বলতে জানেন না মহিম বাবু ? আপনার অভাব কিসের যে আপনি পুরস্কার চাইছেন ? তা ছাড়া আমার আছেই বা কি যে দেবো ?

মহিম একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল, দেবার মত কিছু কি নেই ? এবং আরও কিছু বলিতে গিয়া সহসা মনোরমার মুখের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের দিকে চাহিয়া ঘাড় হেঁট করিল।

কি বললেন ? ওঃ বুঝতে পেরেছি আপনার কথা !

মহিম বিবর্ণ মুখে চাহিল।

শোন মহিম, তুমি যেদিন রাত্রের অন্ধকারে আমার সুমুখে এসেছিলে, আমি তখন তোমার মুখের দীপ্তিটুকু দেখে ভাবলুম তুমি দেবতা, কিন্তু আজ বুঝেছি তুমিও মানুষ, রক্ত মাংসের তৈরী তুমি। আজ বুঝতে পাচ্ছি তোমার মুখে সেটুকু আগুনের ফুল্‌কি ছিল। উপকারের কথা বলছিলে? জগতের ওপর আমারও যে ক্ষুদ্র অধিকারটুকু আছে তারই জোরে আমি তোমার কাছে সাহায্য নিয়েছি, কিন্তু সে বাঁধনটুকু তুমি আজ নিজেই কাটলে ভাই, বলিতে বলিতে অধীর আবেগে মনোরমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

মহিম বজ্রাহত হইয়া মাথা নীচু করিল। এত বড় আঘাত সে জীবনে পায় নাই। সহসা একটা বিদ্যুৎ শিহরণ তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিল। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন আবার সে আসিল। মনোরমা হবিষ্যান্ন চড়াইতেছিল, তাহার সুমুখে আসিয়া বলিল, আমায় মাপ করুন, আমি ভুল বুঝতে পেরেছি।

ম্লান হাসিয়া মনোরমা বলিল, তোমার সকল দোষ যে আমায় মাপ করতে হবে ভাই, তোমার উপকার যে আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

মহিম দাঁড়াইতে পারিল না, চলিয়া যাইতেছিল, মুখ বাড়াইয়া মনোরমা বলিল, তোমার টাকা কটা আর বিছানা চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, পেয়েছ বোধ হয়?

হ্যাঁ।

সেদিন সান্ধ্য সমিতির আখড়ায় খগেনবাবু বলিলেন, সব শুন্‌লে ত?

সকলে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ?

এমন মিট্‌মিটে ডান তা জানতুম না, সাত মাসের চাঁদা বাকি আর ওদিকে দান ছত্তর খুলে বিধবা ছুঁড়িটাকে নিয়ে কি বেলেল্লা গিরিই করছে, জমিদারের বেটা কি না—তার জন্যেই ত রহিম ছোঁড়া মার খেয়ে ম'ল, সেই পথ দেখালে।

বলাই রাগিয়া গিয়াছিল, বলিল, তার হাড়টা কি ভেঙ্গে গেছে, খুড়োমশাই!

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া খগেন বাবু বলিলেন, তুমি বোঝ না বলু, ও মুসলমানের হাড় আবার ঠিক জোড়া লাগবে, কই হতভাগা গেল কোথায়?

রহিম বাহিরে অন্ধকারেই চেটাইয়ের উপর 'বার বাঁধা' বাঁ হাতটা ধরিয়া বসিয়াছিল, আস্তে আস্তে উঠিয়া ভিতরে আসিল। চোখের জল সে যে এইমাত্র মুছিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

আর তাদের বাড়ী যাবি হতভাগা? এত চেষ্টা করি হিন্দু মুসলমানের মেলবার জন্যে, কিন্তু তা কি তোদের মতন পাষণ্ডদের জ্বালায় হবার যো আছে? হুঁঃ, বলিয়া তিনি হুঁকায় একটা জোরে টান দিয়া উপর দিকে ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় বলিলেন, কেন তুই অমন নষ্টামি করতে গেলি? মেরে বসলুম, হাতের যন্ত্রণা হচ্ছে খুব?

চোখের জল আর রহিমের বাধা মানিল না। কিন্তু তাহা অতি কষ্টে রোধ করিয়া না বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া এক হাতে মুখখানা ঢাকিয়া সে অন্ধকারে বসিয়া পড়িল। তাহার এ অশ্রু শুধু যে হাতের বেদনার জন্যই তাহা নয়, কিন্তু প্রহারের ঘায়ে হাত

ভাঙ্গা সত্ত্বেও যে তাহার 'দিদির' বৈধব্যটুকু রদ হইল না, এ অশ্রু সে কারণেও।

৪

মেয়েটাও বাঁচিল না। লিভার পিলেতে হল্‌দে হইয়া, দম্ আটকাইয়া একদিন্ দুপুর বেলায় তাহার শেষ হইয়া গেল। সাহায্য করিবার আর কেহ ছিল না, শুধু রহিম অদূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। মনোরমা তাহার দিকে একবার চাহিয়া ছেঁড়া কাঁথাবালিশ মাদুরসুদ্ধ মৃত দেহটাকে তুলিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিল। একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ স্বর যেন মৃত দেহটাকে ভেদ করিয়া কেবলই তাহার কানে কঠিন হইয়া বাজিতে লাগিল, 'দুটি ভাত দিতে পার মা?'

নির্জ্জন দুপুরের রৌদ্রটা জনশূন্য ভগ্ন পুরীর মধ্যে খাঁ খাঁ করিতেছিল। সুমুখের ভিজা পাঁচিলের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া তাহা হইতে এক প্রকার ধোঁয়া বাহির হইতেছিল।

- কি হবে রহিম?

রহিম চোখ মুছিয়া বলিল, আমি এখনি উপায় করে দিচ্ছি।

একদৃষ্টে মৃত কঙ্কালখানার পানে চাহিয়া মনোরমা পুনরায় বলিল, এর হাড়খানা গঙ্গায় দিস্ ভাই, বড্ড জরে ভুগেছে।

*   *   *

দিন দুই বাদে মনোরমা যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, রহিম কোথা হইতে আসিয়া বলিল, কোথায় যাচ্ছ দিদি?

এস ভাই রহিম, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি, দেখা হ'ল ভালই হ'ল।

তুমি চলে যাচ্ছ?

হঁ্যা ভাই ; আমার সতীনপো, সে ত আমারই ছেলে, আমি তারই কাছে কল্‌কেতায় গিয়ে থাকব, সে আমায় কখনই ফেলতে পারবে না। তুমি খুব ভাল হয়ে থেকো ভাই, আর যেন গরীবের উপকার করতে যেও না, তা হলে ও হাতটিও যাবে, চল বেরোই, বলিয়া চক্ষের জল মুছিয়া একটা ছোট পুঁটুলি লইয়া রহিমের কাঁধে হাত দিয়া সে বাহির হইল।

সেদিন সকাল বেলা খগেন বাবুর স্মুখে গিয়া রহিম বলিল, আমার বাকি মাইনে চুকিয়ে দিবেন কর্ত্তা।

বিস্মিত হইয়া খগেন বাবু বলিলেন, মাইনে! কিসের?

যা পাওনা আছে।

ওঃ, বলিয়া অলক্ষ্যে তিনি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এ মুখের সহিত তাহার কোনও দিনই পরিচয় ছিল না। আজ দেখিলেন মুসলমান জাতির সমস্ত কাঠিন্যের চিহ্নটুকু সে মুখে বর্ত্তমান, বয়স অল্প হইলেও জাত সাপ বটে!

হঁ্যা বাকি আছে বটে,—মাইনে নিয়ে কি করবি রহিম?

দেশে যাব, আর তোমার তরফে কাজ করব না।

আচ্ছা, ও বেলা দিয়ে দেবো।

বিকাল বেলায় মাহিনা লইয়া রহিম দেশে মা বাপের কাছে চলিয়া গেল।

সান্ধ্য সমিতির আড্‌ডা তেমনি ভাবে বসে তাস খেলাও হয়।

চাঁদা আদায়ও সেইভাবে হয়। খগেনবাবু বলেন, সাত মাসের চাঁদা বাকি রেখে ছোঁড়া ডুব মারলে, জমিদারের বেটা কিনা।

বলাই বলে, আপনারও তিন মাসের বাকি।

খগেন বাবু তেমনি ভাবেই বলেন, ওই যা, পাঁচ কাজে ভুলে গেছি।

*　　　*　　　*　　　*

ভাঙ্গা বাড়ী তেমনি পড়িয়া আছে। রাত্রির ভয়ার্ত্ত অন্ধকার তেমনি ভাবেই শূন্য পুরীতে জমাট বাঁধে, ঝিঁ ঝিঁ কাঁদে, শেয়াল ঘুরিয়া যায়।

ভুঁই-চাঁপা

তারপর, তোমায় কি বলা হল ?—

সুধীর বৌ-দিদির প্রশ্নে থতমত খাইয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। সুনীতি ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, থাম্‌লে যে ? আর কোন আঘাতই আমায় টলাতে পারবে না—

সুধীর নতমুখে বলিল, দরজায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর টল্‌তে টল্‌তে এসে—

টল্‌তে টল্‌তে ? কেন ? সেই ছাইপাঁশ খাওয়া হয়েছিল বুঝি ?

হ্যাঁ।

তারপর ?

বল্লে যে, আমি এখন আর যেতে পারব না, আমার অনেক কাজ; আমি অনেক অনুরোধ করলুম, শেষে তিনি চলে যেতে যেতে বল্‌লেন, আমায় বিরক্ত করো না, আমি এখন যেতে পার্‌ব না।

সুধীরের গলা ধরিয়া আসিতেছিল; কেন যে এমন স্নেহের, করুণার

প্রতিমূর্ত্তি বৌ-দিদির উপর তাহার দাদা এমন নিষ্ঠুর অবিচার করিতে পারে, তাহা স্বধীর কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। সে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল ; ক্রোধে ও অভিমানে সে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল।

বক্ষের জমাট-অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া স্থির কণ্ঠে স্থনীতি বলিল, যে বাড়ীতে তিনি থাকেন, সেটায় কি আর কেউ থাকে, কোনও কোনও ?—

তা আমি জানি না। বলিয়া স্বধীর বেগে বাহির হইয়া গেল।

দূরে নারিকেল বৃক্ষ হইতে কয়েকটা চিল চীৎকার করিতেছিল ; রেলের বাঁশীর একটা ক্ষীণ আর্ত্তস্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল ; আসন্ন সন্ধ্যার রক্তরাগচ্ছটায় ওই দূরে আমগাছের শীর্ষটা রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল। স্থনীতির কম্পিত ওষ্ঠাধর কেবলই বলিতে চাহিতেছিল, আর তিনি আসিবেন না। স্থনীতি ভাবিতে লাগিল, ইহার কি কোনও উপায় নাই ? যদি অত্যাচারের বিপক্ষে তাহারা দাঁড়াইত ; যদি তাহারা অবিচারের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। যদি পুরুষের দৃষ্টি হইতে আপনাকে সরাইয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা হইলেই বুঝি পুরুষকে কতকটা বুঝিতে পারা যাইত।

স্থনীতির কান্না পাইল ; ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, কেন এত অবিচার করুছ তুমি ? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নি ! কিন্তু কে শুনিবে ?

রাত্রিতে নিকটে আসিয়া স্বধীর ডাকিল, বৌ-দি—

স্থনীতির সবে তন্দ্রা আসিতেছিল, বলিল,—কি বলছ ঠাকুর-পো ?

শুয়ে রইলে, খাওয়া-দাওয়া করুলে না ?

আজ শরীরটা ভাল নেই, কিছু খাব না ভাই



সুধীর চলিয়া যাইতেছিল। অভিমানী দেবরটিকে সুনীতি বেশ ভাল করিয়াই চিনিত, সুতরাং তাহার এই কথা যে তাহার দেবরকেও উপবাসী রাখিবে, এবং ক্ষুধার মুখে দেবরের এ উপবাস হয় ত তাহার স্বাস্থ্যে বিঘ্ন ঘটাইবে,—এটা সুনীতি আগে ভাল করিয়াই জানিত, তাই পুনরায় বলিল, আচ্ছা চল, যাচ্চি।

সুধীর দাঁড়াইয়া রহিল। সেও কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিয়া ছিল যে বৌ-দিদির শরীর ভাল না থাকিবার কারণ তাহারই আজিকার আনীত সংবাদের সহিত অনেকটা সংশ্লিষ্ট ছিল।

ও রকম ক'রে ভেবে নিজের মন খারাপ করো না ঠাকুর-পো, চল রাত হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সুধীর সুনীতির অনুসরণ করিল।

এইরকম ভাবেই দুই মাস কাটিয়া গেল। এপর্য্যন্তও সুধীর আর তাহার দাদা ললিতের খবর পায় নাই; সুনীতিও লইতে বলে নাই। সন্তান-সন্ততি কিছুই হয় নাই, যাহাকে লইয়া সুনীতির সারাদিনের দীর্ঘ অবসরটা কাটিতে পারে, আর তাহার দিন কাটিতে চাহিতে ছিল না। সুধীরের সঙ্গে গল্প করিতে বসিলে, অর্থাৎ অন্য কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিজেকে অন্যমনস্ক করিতে চাহিলে, সেই এক চিন্তাই মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে; চক্ষের জল রোধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা পাইয়া দেবরের নিকট হইতে উঠিয়া যাইতে হয়; সুধীরের দৃষ্টি তাহা এড়ায় না, তাহার সান্ত্বনা-বাক্যগুলি শেষে সুনীতির লজ্জার কারণ হয়। নির্জ্জনে থাকিলে চিন্তা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।

কতদিন সে কাতর হইয়া ললিতকে চিঠি দিয়াছিল, কিন্তু উত্তর পায় নাই। সে মাত্র জানিতে চাহিত, তিনি কুশলে আছেন

কি না। সংসারের অভাব অনটন, প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের জন্য তাহারা দুই জনে কতটা দায়ী হইয়া পড়িতেছে, তাহা সুনীতি তাঁহাকে জানাইয়া বিরক্ত করে নাই। বিদেশে চাকরী কি কেহ করিতে যায় না? চাকরী করিতে যাইয়া কি সকলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী-পুত্রকে ভুলিয়া যায়? বার বার কাতর হৃদয়ে সে পত্র লিখিয়াছে, 'ওগো তুমি কেমন আছ? একবার উত্তর আসিল, 'আমায় জ্বালাতন করিও না, এখন যাইতে পারিব না।—'

সুধীর কতকটা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বৌ-দি, কাঁদ্ছ তুমি?

না ভাই। বলিয়া সুনীতি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সুধীর ডাকিল, বৌ-দি, শোন—

কি?

তুমি নিজের শরীরের দিকে চাইছ না, এ রকম ভেবে ভেবে আর কতদিন বাঁচ্বে বল ত? আমাদের সংসারে আর কেউ নেই, তার ওপর তুমি যদি অমন করে দিন-রাত শরীরটাকে কালি ক'রে ফেল, তাহলে আমরা আর কার আশ্রয়ে দাঁড়াই?

ভাবনা ভিন্ন কি ভাই মানুষ থাকৃতে পারে? এই দেখ না, ঘরে আজ চালডাল কিছু নেই, পয়সা-কড়ি সব ফুরিয়ে গেছে, এ রকম ক'রে আর কি ক'রে চলে বল দিকি?

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া সুনীতি বড়ই অপ্রস্তুত হইল। সুধীর বিস্মিত হইয়া বলিল, কই, এ কথা তুমি আমায় বল নি ত?—

দিন-রাত তোমায় এসব অভাবের কথা বলে আর কি বিরক্ত করতে ভাল লাগে?

তাহলে আমি জিনিস-পত্রগুলো এনে দিই—

"না, আজ আর কিছু আন্‌বার দরকার নেই, তোমার খাবার তৈরী আছে।

আর তুমি ?

সুনীতি একটু ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, না, আমি আজ আর কিছু খাব না ভাই, আমার মাথাটা একটু ধরেছে।

একটু বিজ্ঞের ভাণ করিয়া সুধীর বলিল, খাবার ইচ্ছে না থাকলে বোধ হয় অনেকেরই মাথা ধরে।

সত্যি ভাই, মিথ্যে কথা বল্‌ছি না।

কেন, জ্বরের মতন হয়েছে নাকি ?

কি জানি।

দেখি বলিয়া সুধীর সুনীতির কপালে কতকক্ষণ হাত টিপিয়া দেখিল, সত্যই জ্বরে সুনীতির মাথা ভাঙিয়া যাইতেছে !

সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এ-ত খুব জ্বর হয়েছে দেখ্‌ছি—আমায় এতক্ষণ বল নি কেন বৌ-দি'—যদি এ জ্বর বাড়ে ?

তোমায় বল্‌লে তুমি কি করতে, আর এখনই বা কি করবে ?

সুধীর ভাবিল, তাইত ! সে কি করিবে ? টাকাকড়ি কিছু নাই, কোথা হইতে আসিবে তাহারও ঠিক নাই ; ধারে ধারে মাথা বিকাইয়া যাইতেছে, পাওনাদাররা তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সুনীতি বাড়ীতে একলা থাকে, বাড়ীখানা খাঁ-খাঁ করিয়া যেন তাহাকে খাইতে আসে, সুতরাং এ পর্য্যন্ত সে-ও কোন কর্ম্ম করিয়া সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ঘটি-বাটী যাহা কিছু খুচরা জিনিসপত্র ছিল, তাহাও বিক্রয় করিয়া এত দিন চলিয়াছে, কিন্তু আর যে চলে না।

ধীরে ধীরে সুধীর বলিল, যাই যেমন ক'রে হোক একটা জ্বরের ওষুধ এনে দি।

যাহোক ক'রে, মানে ফের ধার ক'রে?—না ঠাকুর-পো, আর ধার কর্‌বার চেষ্টা করো-না, মহাজনের কড়া কথা, অপমান আর সওয়া যায় না, তার চেয়ে যা বরাতে আছে তাই হবে।

সুধীর শ্রান্তভাবে বসিয়া হাতে মুখ ঢাকিল। সুনীতি ঘরে ঢুকিয়া সুধীরের বিছানা প্রস্তুত করিয়া দিল, তারপর ঘর ঝাঁট দিয়া যখন বাহিরে আসিল, দেখিল সুধীর তখনও একভাবে বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া সুনীতি ডাকিল, ঠাকুর-পো?

প্রবল জ্বরের উত্তাপে সুনীতির গা থম্ থম্ করিতেছিল।

এমন ভাবে আর কি ক'রে চলে, বৌ-দি?

সুনীতি বলিল, ভয় কি ভাই ঠাকুর-পো? আমি ত আছি।

বুকের ভিতর হইতে একটা প্রবল উপহাসের অট্টহাসি বাহির হইতে চাহিল,—কিসের অভয় সে দিতে পারে! আর কি আছে তাহার! শূন্য সংসারের অভাব, পাওনাদারের রক্তচক্ষু অন্তরীক্ষ হইতে তাহাকে শাসাইয়া উঠিল। তাহার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। বাহিরে অভাবের জ্বালা, ভিতরে জ্বরের অগ্নিসম উত্তাপ! দেওয়ালের গায়ে সুনীতির অবসন্ন দেহ হেলিয়া পড়িল। চক্ষু জ্বালা করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুধীর বলিল, বৌ-দি, তোমার জ্বরটা যে বড় বেড়ে উঠল।—ও কি! আবার কাঁদ্‌ছ?

থাক্ থাক্—জ্বর হলে অমন চোখ দিয়ে জল পড়ে ভাই।

তা পড়ে বটে, কিন্তু গলাটা অমন ধরে' ওঠে না, বৌ-দি—

সুনীতি হাসিয়া বলিল, ওঃ তুমি বড় চালাক!

সুধীর দাঁড়াইয়া বলিল, চল শোবে চল—এরপর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বেশী বেড়ে যাবে।

সুনীতি উঠিতে পারিতেছিল না, বলিল, আর একটু থাকি, যাব' খন।

সুধীর বুঝিতে পারিয়া বলিল, আচ্ছা আমি ধর্‌ছি, আস্তে আস্তে চল।

সুনীতি শয্যা লইল।

জ্বরটা যে এত ভোগাইবে তাহা সুধীর ভাবিতে পারে নাই, দুই-তিন দিন সুনীতির অনুরোধে সে কোনরূপ ঔষধ পত্রের চেষ্টা করিল না; একেবারে যখন সুনীতি অচৈতন্য বাক্‌শক্তিহীন হইয়া পড়িল, সুধীর কম্পিতবক্ষে ডাক্তারের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু দুঃখের পালা শেষই হউক অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক, বিজ্ঞ চিকিৎসক যখন আসিয়া ললাট কুঞ্চিত এবং মুখ ম্রীয়মান করিল, সুধীর অন্ধকার দেখিল। তার যে আর জগতে কেহ নাই। ডাক্তার বলিল, জ্বরটা একটু শক্ত রকমের বাপু, প্রথম থেকেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। এ জ্বরে দু' তিনটে রোগী,—যাক্‌ ভাল ক'রে সেবা করতে হয়—

সুধীর উদ্বিগ্ন-কাতর স্বরে বলিল, সার্‌তে কতদিন লাগবে ডাক্তার বাবু?

এ জ্বরটা সাতদিনই থাকে। ছাড়বার সময়ে খুব সাবধানে রাখ্‌তে হয়। তারপর একটা দিন কাটাতে পার্‌লেই সেরে যাবে, আর কোন ভয় থাক্‌বে না।

ডাক্তার চলিয়া গেল; মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সুধীর ডাকিল, বৌ-দি! তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিমীলিত চক্ষে স্নীতি বলিল, কি ভাই ঠাকুর-পো? উঃ জ্বরটা বড় বেড়েছে, কথা বল্‌তে পার্‌ছি না।

ভাল হয়ে যাবে, ভয় কি বৌ-দি?

ক্ষীণ হাসিয়া স্নীতি বলিল, ভয়—ভয় নয় ভাই দুঃখ।

৩

পরিশ্রমী এবং সৎস্বভাব বলিয়া আপিসে ললিতের খুব খ্যাতি ছিল এবং সেই হেতুই সামান্য বেতনের কেরাণী হইতে ক্রমে ক্রমে সে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের পদে উন্নীত হইয়াছিল। সামান্য চল্লিশ টাকা মাহিনা হইতেই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিন শত টাকা মাহিনা পাইতে লাগিল।

কিন্তু এই সৎস্বভাব এবং লাজুক যুবকটি তাহার বাসার অনেকের ঈর্ষার পাত্র হইয়া দাঁড়াইল; কেন না এই চালাক-চতুর এবং ধড়িবাজ লোকগুলি প্রত্যহ নয় ঘণ্টা ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ এবং 'শহুরে বাবুয়ানা' করিতে পায় না, আর এই গেঁয়ো হাবা লোকটা,—না-জানে চাল চলন, না-জানে আজব শহরের কাপ্তেনী, এ কিনা অনায়াসে তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এতগুলি টাকা আনে? এই হেতু ললিতের অনেক কৃত্রিম বন্ধু আসিয়া জুটিল। আজ এটা, কাল ওটা, একদিন থিয়েটারে যাওয়া, পরদিন দুটো গান শুনিয়া আসা, এইরূপ করাইতে করাইতে ললিতের স্বভাবটা বিগড়াইয়া দিল। ললিত মানবজনমের পরম ও চরম সার্থকতা লাভ করিতে শিখিল।

ইদানীং আপিস হইতে বাসায় ফেরা ললিত প্রায় বন্ধ করিয়া

দিয়াছিল ; তা ছাড়া তাহার শরীরটাও খারাপ হওয়াতে সে একমাসের অবসর লইয়াছিল।

সেদিন বৈকালে অত্যধিক মদ্যপানে বিভোর হইয়া ললিত বিছানায় ঢলিয়া পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া এক একবার অদূরে উপবিষ্ট মুরলার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। মুরলা তখন প্রসাধনের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু কি একটা আকস্মিক বিরক্তিতে তাহার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। ঘাড় ফিরাইয়া একটু প্রখর করিয়া মুরলা বলিল, দিন-রাত্তির ওই ছাই-ভষ্মগুলো খেতে হবে, একটা কথা বলবারও কি সময় নেই ?

সুরার ঘোরে ললিত বলিল, কে বাবা তুমি, উল্কার মতন ধপ্ করে আকাশ থেকে পড়লে ?

দৃষ্টিটা আরও প্রখর করিয়া মুরলা বলিল, এখানে বসে আর তুমি মদ খেতে পাবে না।

কেন বাওয়া, তাড়িয়ে দেবে নাকি ? তুমিই ত আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ, পিয়ারী ! গাও, গাও, একটা গান লাগাও !

ক্রুদ্ধ হইয়া মুরলা বলিল, আবার ? এ সব চাল-চলন আর আমার কাছে চল্‌বে না, বলে দিচ্ছি।

একেই ত প্রথম হইতে মুরলার আকার ইঙ্গিতে কেমন একটা গম্ভীরতা প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার উপর আবার এই তীক্ষ্ণ কথাগুলি শুনিয়া ললিতের সুরাপানের মোহময় উন্মাদনার ঝোঁকটা যেন অনেকটা কাটিয়া আসিতেছিল একটু আত্ম-সংযতভাবে বলিল, কি, কি বল্‌ছ, মুরলা ?

বল্‌ছি এ রকম বেয়াদপি আর চল্‌বে না।

মাতালের হাসি হাসিয়া ললিত বলিল, অন্য শিকার মিলেছে নাকি, বন্ধু!

এত আমি সইতে পার্‌ব না, ললিত!

ললিতের মোহ টুটিল, বলিল,—আমায় কি বল্‌ছ তুমি, মুরলা?

একটু নরম হইয়া মুরলা বলিল, অত ক'রে মদ খেয়ে দিন দিন যে একেবারে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, মুরলা,—আমি ত তোমায় অনেক পয়সা দিয়েছি।

মুরলা উত্তেজিত হইয়া বলিল, পয়সা?—পয়সাই কি সব? শুধু পয়সার জন্যই কি আমরা এ ব্যবসা ক'রে থাকি?

তবে? আজ এ সব কি বল্‌ছ, মুরলা?

বল্‌ছি ঠিক! যাক্‌ সে কথা, আমি একটা পরামর্শ কর্‌তে এসেছিলুম, যদি—

কিসের পরামর্শ?

দান-পত্রের। চুপ কর্‌লে যে, রাগ করেছ?

না, রাগ নয় মুরলা, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি কত কুহকই তোমরা জানো।

অবাক হবার কিছু নেই, ললিত।

বিভ্রান্ত হইয়া ললিত বলিয়া উঠিল, এ সবের কারণ?

কারণ কিছু নেই। এ মানুষের একটা ইচ্ছে—রুচির পরিবর্ত্তন।

তোমার উপায়?

উপায় কিছু একটা হবেই।

ললিত সহসা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, তা হলে কি আমায় এখন বুঝ্‌তে হবে যে, আর আমি এখানে আসি তা তোমার ইচ্ছে নয় ?

হাঁ তাই, আমি সব জান্‌তে পেরেছি, সেদিন তোমার ছোট ভাই এসেছিল, মদের ঘোরে তুমি তাকে তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু আমার দয়া হল। আমি তার কাছ থেকে, তোমার সংসারের সব খবর নিলুম, কোথায় একটা অজানা পল্লীর নির্জ্জন ঘরে বসে তোমার স্ত্রী দিনের পর দিন চোখের জল ফেল্‌ছে,—কিন্তু তুমি তার কোন খোঁজই নাও না।

এ একটা হাসির কথা মুরলা, যে সে খবর তুমি নিয়েছ ।

হাসি নয়, ললিত ! এ অতি সত্য ! মেয়ে মানুষ হয়ে তা'র মন বুঝতে পারি ।

ললিতের মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু এতে তোমারই অনিষ্ট।

অনিষ্ট ? না ললিত এ অনিষ্ট নয়, এ অতি সৌভাগ্য ! অন্তত জানবো, জীবনে একবারও পরের উপকার কর্‌তে পেরেছি ।

আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, আসন্ন ঝটিকাভীত এক-একটা বায়স এদিক-ওদিক উড়িয়া যাইতেছিল, ট্রাম গাড়ীর ঘর্ঘরধ্বনি ঘরখানাকে কম্পিত করিয়া যাইতেছিল ; মুরলা গবাক্ষের নিকট আসিয়া বাহির আকাশের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, বিশ্বাস করতে পারবে না তুমি ।—

শোন, মুরলা !

মুরলা মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, না আর আমার কিছু বল্‌বার নেই, তুমি যাও—

বিদ্যুদ্বেগে ললিত উঠিয়া আপনার জামা কাপড় ঠিক করিয়া লইল, পরে গায়ের চাদরটা লইয়া সত্যই যখন বাহিরে যাইবে, মুরলা সহসা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আর কি আস্‌বে না তুমি ললিত?

আর? না মুরলা, আর আমি আস্‌ব না।

মুরলা এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইল! একটা কথা বলে যাও, ললিত।

ললিত বলিল, না, আমি চল্‌লুম তবে মুরলা!

মুরলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিল না, সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল।

মুরলা একবার চাহিল, শেষবার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর নিবিড় অন্ধকার! মোটর গাড়ীর একটা শব্দ হুঙ্কার করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। কক্ষান্তর হইতে তাহারই এক সঙ্গিনীর কলকণ্ঠ তীক্ষ্ণ বাণের মত আসিয়া তাহার কর্ণে লাগিল।

৪

বাদল-রাতের আকাশটা নিঝুম হইয়া ছিল; টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া এক একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল। এ সবের দিকে ললিতের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে দেখিতেছিল, ওই দূরে তাহার চিরপরিচিত গ্রামখানা একটা অন্ধকারের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে তাহার অতীত সুখের কত স্মৃতিই না জড়িত। দীন দরিদ্রের মত কতই না ব্যগ্র আশায় তার পথপানে চাহিয়া আছে। তাহার মধ্যে একটি গৃহের কোণে তাহারই অনাদৃতা পত্নী কতদিনের অশ্রু সঞ্চিত রাখিয়া আশায় আকুল নয়নে শূন্য পানে চাহিয়া আছে।

পিচ্ছিল পথটা দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়া শ্মশানে মিশিয়াছে। ললিত

বাঁ দিকে ফিরিল, একটা কুকুর দুই একবার চীৎকার করিয়া নিস্তব্ধ হইল ; তৃণ শস্পের মধ্য দিয়া একটা সাপ হিল-হিল করিয়া চলিয়া গেল ; দক্ষিণে বহুদূর হইতে একটা শৃগাল প্রহর-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। হন্ হন্ করিয়া ললিত চলিল।

বাটীর দরজায় আসিতেই ললিত চমকিয়া উঠিল, ওটা কি!

কে দাঁড়িয়ে ?

অধিকতর চমকিয়া ললিত বলিল, কে সুধীর নাকি ?

হঁ্যা।

ওটা ওখানে কি ?

শুষ্ককণ্ঠে সুধীর বলিল, বৌ-দিদি—

সে কি! এত ঠাণ্ডায় ? ললিতের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

বাইরের ঠাণ্ডা আর তাকে স্পর্শ করবে না দাদা।

মূঢ়ের মত ললিত বলিয়া উঠিল, কেন, কোথায় যাচ্চে ?

অস্ফুট গাঢ় কণ্ঠে সুধীর বলিল, শ্মশানে—

ছবি

কমলাদীঘির নায়েব অবনী মুখুজ্যের বার-মহলে খাজনা আদায় কর্ত্তে য়াওয়াই কাল হল ; ফিরে এসে যখন শুনলে তার সুরূপা এবং পতিব্রতা স্ত্রী ইন্দুকে দুবছরের খোকার ব্যগ্র বাহুপাশ থেকে দস্যুরা ছিনিয়ে গেছে তখন সে কাঁপতে কাঁপতে আপনার নতুন পাকা দালানটার ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। দুনিয়াটা তার চোখের সুমুখে অন্ধকার হয়ে হাঁ করে গ্রাস করতে এল।

আগের দিন রাত্তিরে এই ঘটনা ঘটেছে। পাড়ার একজন স্ত্রীলোক

খোকার কান্নাকে শান্ত করবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়ীতে, অবনী এসেছে শুনে খোকাকে নিয়ে এল। অবনী তখন অঝোর ঝরে কাঁদছিল, খোকাকে দেখে তার কান্না আরও উদ্বেল হয়ে উঠল।

সত্য সরকার গিরীশ গরাই, বলরাম বাউরী প্রভৃতি পড়শীরা অনেক সান্ত্বনা এবং সহানুভূতি জানিয়ে শেষে বললে, কি আর করবে হে অবনী আমরা কাল সমস্ত রাত্তিরই ভেবে দেখলুম, আপাতত তোমার করবার আর কিছুই নেই—আহা বউ ত নয় লক্ষ্মী, যেমনি রূপ তেমনি মায়ের পয়, তারই সুনজরে তুমি দু'বছরের নায়েবীতে কোঠা তুললে, কিন্তু ভগবান তোমার এ সুখটুকুও সইতে পারলেন না—

ব'লে বার দুই চোখ রগ্‌ড়ালে—

একপাশ থেকে ঘনশ্যাম বললে, এই ঠাকুর ঘরটি বুঝি মা লক্ষ্মীর জন্যে তৈরী করিয়েছিলে অবনী? আহা বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ কচ্ছে। মায়ের পায়ের দাগগুলোও মুছে যায়নি দালান থেকে—

তরঙ্গিণীর বোনঝি বললে, বউটার রাশভারী ছিল খুব, সরকার কাকা—চুপ কর বাপু ঘ্যানঘেনে ছেলে, বাপের দুঃখটা বুঝলিনে—

খোকা এ ঝঙ্কারে আরও কেঁদে উঠল, অবনী তাকে কোলে নিয়ে শান্ত করবার ছলে এঘর সেঘর বেড়িয়ে তার শেষ সন্দেহটুকু মিটিয়ে নিলে।

চার দিন পরে অপরাহ্ণ বেলায় গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল,—'চোরা বউ' ফিরে এসেছে। অবনী তখন চালে ডালে সিদ্ধ করছিল—কাঠের ধোঁয়ায় তার চোখ রক্তবর্ণ। খবর শুনে কি করবে কিছু ঠিক করতে পারলেনা। কিন্তু পরক্ষণেই দশহস্তীর বলে ঘুমন্ত ছেলেটাকে তুলে নিয়ে উন্মত্তের মত দৌড়ে গেল রাস্তায়।

গাছ তলায় ধূলিমলিন দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ইন্দু বসে কাঁদছিল! মাথার রুক্ষ চুলগুলো তার পরিষ্কার মুখখানিকে ঢেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল অসংখ্য সাপের ফণার মত। আশে পাশে পঁচিশ ত্রিশ জন স্ত্রীপুরুষ দাঁড়িয়ে জটলা কচ্ছিল এবং দস্যুর ওপর তাদের ক্রোধ কতখানি যে হয়েছিল তা তারা জানিয়ে দিচ্ছিল এই নির্য্যাতিতা অভাগীর হেঁট মুণ্ডের ওপর অজস্র বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রে—পোড়ার মুখি টুঁ শব্দটি কল্লিনে? হাজার খানা দা কুড়ুল নিয়ে আমরা এক লহমায় হাজির হতুম

তুই এ গ্রামের নাম ডোবালি, আমাদেরও নাম ডুবিয়ে দিলি—

তোর মুখ দেখলে চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়—

দূর হ অভাগী এখান থেকে, ও কালামুখ আর দেখাস্‌নে—

তরঙ্গিণীর বোনঝি নাক সিঁটকে বললে, শতেক খোয়ারির রূপের আবার কত দেমাক ছিল—

বলরাম বাউরি বললে, কিন্তু তোমার বাছা সাহস করে আর এখানে আসা উচিত হয়নি, যাও রাত হল আবার পথ চিনে কোথাও যেতে হবে ত?

বিস্রস্ত চুলের রাশি সরিয়ে চোখ মুখ তুলে ইন্দু বললে, আমার স্বামী?

উপস্থিত সকলে হো হো করে হেসে উঠল। বাউরী বললে, পাগলি কোথাকার,—তার সঙ্গে দেখা করার বিধি কি আর শাস্ত্রে আছে?

ইন্দুর শেষ আশা নির্মূল হতে চললো—সকলের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বুকের রুদ্ধ অশ্রুর দ্বার খুলে দিয়ে বললে, আমায় রক্ষে

করুন, দয়া করুন, আমার কোনো দোষ নেই, কোনও উপায় নেই আমার, আমায় পায়ে ঠেলবেন না—

—তা হয় না বাছা—

একজন বললে, যাওনা বাপু, কত মেয়েমানুষ ত আপনার হিল্লে করে নেয়—যাও চোখের জল ফেলে গ্রামের অমঙ্গল কর না—

অস্ফুটে কেঁদে ইন্দু বললে, দয়া করুন, আমায় বাড়ীতে যেতে দিন, নৈলে আমার কোথাও ঠাঁই নেই—

—না, তা পারব না, শাস্ত্রের বিধি আছে, উপরে ভগবান্ আছেন, ধর্ম্ম আছে—

বিবর্ণমুখে ইন্দু বললে, আপনারা মহৎ ব্যক্তি, দয়া করুন আমাকে।

অকস্মাৎ উন্মাদের মত অবনী ছেলেকে কোলে নিয়ে ভিড় ঠেলে ঢুকল—ইন্দু—ইন্দু—

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ইন্দু—কেন এলে তুমি। খোকাকে কেন নিয়ে এলে—খুকু, আমার খুকু,—বলে সে ব্যগ্র বাহুলতা বাড়িয়ে দিলে অবনীর দিকে, তার চার দিনের অদেখা খোকাকে কোলে নেবে বলে—

সর্ব্বনাশ হয় দেখে গিরীশ গরাই ছুটে এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে, দাঁড়াও হে অবনী; অত উতলা হয়োনা, আমাদের দিকটা দেখা চাই ত, আমরা এখানে উপস্থিত থাকতে এ কাণ্ড হলে আমাদেরও যে একঘরে হতে হবে, কি বল কেদার খুড়ো?

—বটেই ত—

—তাই, বলি কি, অস্পৃশ্যাকে নিয়ে ঘর করাটা ত—

ইন্দুর চোখ দুখো জলে উঠেই আবার ছাই হয়ে গেল। অবনী বললে, অস্পৃশ্যা কি ও যে ইন্দু, আমার স্ত্রী, কি বলছ গিরীশ?

—হেঁ হেঁ, চল মাথা ঠাণ্ডা করবে চল, ওহে ঘনশ্যাম, এসো-না এদিকে। সকলে ধরে বেঁধে অবনীকে ফিরিয়ে নিয়ে চললো।

ইন্দু দৌড়ে গিয়ে তাদের পায়ের কাছে পড়ে বললে, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, খুকুকে একবার কোলে দাও—একবার, দাও—

বাতাসে তার কান্না ভেসে গেল। অবনীর আর্ত্তস্বরটাও তারা নিজেদের গণ্ডগোলে চাপা দিলে।

সন্ধ্যার ধূসর আবরণটা তখন বনের পথে, লুটিয়ে পড়ছিল···

২

তিনবছর পরে।

দুপুর বেলা। ইন্দু এখন এ জেলার বড় ইস্কুলের মাষ্টারনী। সেদিন রবিবার, কোথাও বার হয়নি সে। ঘরে বসে কিছুক্ষণ আগে একটা রেশমী কাপড়ের ওপর ফুল তুলতে তুলতে তন্দ্রা এসেছিল। গালের ওপর বেয়ে পড়া চোখের ধারাটি শুকিয়ে উঠেছিল, জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া মৃদু বাতাসের দোলনায়—

বাইরের গোলমালে আতঙ্কে তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতে সে উঠে বসল। চোখ মুছে বাইরে আসতেই গিরিশ গরাই চোখ পাকিয়ে বললে, এ সব তোমার কেমন ব্যাভার বাছা—বেহ্ম মাগীদের মত মাষ্টারী করে ত ছেলে-মেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছে, তার পর দর্জ্জিবৃত্তি করে পাশাপাশি চার পাঁচ খানা গ্রাম ছেয়ে ফেল্‌লে; তুমি নিজের আখের ত পায়ে থেঁৎলে এসেছ, মনের দুঃখে ছোঁড়া বিবাগী হতে বস্‌ল, কিন্তু লেস-সেমিজ বুনে এমন করে ঘরে ঘরে বৌ-ঝিদের মাথা খাচ্ছ কোন্ হিসাবে? এতে তোমার ভাল হবে, না ধর্ম্মে ছাড়বে?

মাথা হেঁট করে রইল ইন্দু; স্বামীর ছন্নছাড়া জীবনটা তপ্ত শেলের মত তাকে যাতনা দিতে লাগল।

ঘনশ্যাম বললে, তুমি হতভাগিনী জানতুম, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি তুমি অসচ্চরিত্র—

কেদার বললে, তোমার দিক দেখলেই ত চলবে না আমাদের, গ্রামের উন্নতিও দেখতে হবে, কি বল হে—বলরাম?

—বটে—বটে—

গিরীশ বললে, কোন রকমেই আর তোমার এখানে থাকা চলতে পারে না, এ জেলা থেকে তোমায় যেতে হবে—

টপ্ টপ্ করে অশ্রু ঝরে পড়ল ইন্দুর গাল বেয়ে, ধরা গলায় সে বললে, এতে যদি অনিষ্ট হয়ে থাকে তবে মাপ করুন আমাকে, কোনো উপায়ই আমি দেখিনি তাই জন্যেই—

—তা ত জানি, তা ত জানি বাছা তোমার মত লক্ষ্মী বউ আমাদের গ্রামে আর কেউ ছিল না, তবে কি জান লোকে আমাদেরই দোষী-ঠাওরায়, হিন্দুসমাজের আবার এই কেমন একটু কড়াকড়ি আছে কি না, জান ত বাছা—?

একজন বললে খ্রিষ্টানী ধরণটা আমাদের সমাজে খাটে না জান ত? ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয়না, তা ছাড়া সত্যি কথা বল্‌তে কি এই চারখানা গ্রাম মায় জেলাসুদ্ধ লোক দুমুখে তোমার সুখ্যাতি করছে—কুলটা পতিতার এত সুখ্যাত হওয়া কি সমাজের পক্ষে হিতকর? ঘরের ঝি বউয়ের মন বিগড়ে যেতে পারে ত?

ঘাড়টা তুলে ইন্দু একবার সোজা হয়ে দাঁড়াল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই

বিবর্ণ মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, কি করব আমারই দোষ হয়েছে, আপনারা দয়া করে ব্যবস্থা দিন—

—তোমাকে এখান থেকে ত চলে যেতে হয় কোথাও—

—তা হলে আপনারা কি আমায় মাপ করবেন ?

—তা দেখা যাবে, তুমি তৈরী হয়ে নাও—

একবার চীৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল ইন্দুর—কিন্তু সবলে তুহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে সে ভেতরে চলে গেল।

তুটো লোক দিয়ে জিনিসপত্তর বার করবার চেষ্টা করতেই গিরিশ বললে, অমন কাজ কর না লক্ষ্মী, তুমি ত যাচ্ছই ও তুটো লোককে কেন মজিয়ে যাও, তোমার জিনিস বয়ে নিয়ে গেলে ওদের কি সমাজে ঠাঁই দেবে আর ?—যা পালা, মাম্‌দো বেটারা—

তারা চলে গেল।

এত সহজে কাজ উদ্ধার হবে তা মাতব্বরেরা ভাবেনি তবুও সন্দেহ মেটাবার জন্যে পরস্পর বললে, চল ইস্টিশানে ছুঁড়িকে তুলে দিয়ে আসি, নইলে বুঝতে পেরেছ ত ? বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু—

তারাও চলতে লাগল।

অবনীর কানে এ খবরটা পৌছতে বিলম্ব হল না, সে ছেলেটার হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হন্‌ হন্‌ করে চলতে লাগল, ইন্দুকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে। অপরাহ্ণ বেলা। এ রাস্তা সে রাস্তা কোথাও অবনী কা'কেও দেখতে পেলে না। হতাশ হয়ে চলতে চলতে স্টেশনের কাছে এসে পড়ল। পাঁচ বছরের ছেলেটা নেতিয়ে পড়েছিল পথ হেঁটে। অবনী বললে, চল খোকা বাড়ী যাই, তারা নেই—

—কে বাবা ?

—কেউ না, চল্—

—না যাব না, আমি রেল দেখব—

—তাই চল্—চোখদুটো অবনীর থম্ থম্ কচ্ছিল। সে অনেক আশা করে এতখানি পথ এসেছিল। স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। আকুল দৃষ্টিতেই সে চিনতে পাল্লে। দৃপ্তা অভিমানিনী অথচ একান্ত সহায়হীন সে কি করুণ দৃষ্টি। সুখ-দুঃখ কিছু নেই সে মূর্ত্তিতে—স্পন্দন-হীন নির্ব্বিকার!

অবনী ছুটে গিয়ে বললে, ইন্দু ও ইন্দু—?

চমকে মুখ ফেরালে ইন্দু, তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, এসেছ? তুমি আসবেই জানতুম—

কোন্ স্রোতে তুমি ভেসে চললে ইন্দু? তোমার দয়া মায়া কি নেই?

সে চুপ করে রইল! অবনী হাত ধরে আবার বললে, তোমার বলবার কি আর কিছু নেই ইন্দু?

—এই বল যেন তোমায় আবার পাই—

—চল ইন্দু চল, যে দিকে দুচোখ যায় আমরা চলে যাই—বলতে বলতে অবনী কেঁদে উঠল!

ইন্দু তেমনি ভাবেই বললে, না তা পারনা, সমাজ, স্বদেশ আর খোকার ভবিষ্যতকে তুমি নষ্ট কর্ত্তে পার না—

খোকা মুখ তুলে বললে, এ কে বাবা?

—আমি? বলে ইন্দু খোকাকে কোলে তুলে তার মুখখানা তার বুকের ভেতর নিয়ে অজস্র চুম্বন করে বললে, আমি কে বলত রে খোকা—বলত, বলত তোর আধো আধো কথাটী যাবার সময় এক-

বার শুনে যাই—বলত ? ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল।

দুহাতে মুখ ঢেকে অবনী বললে, তোমার বুড়ো না সেখানে আছে—

তাই ত যাচ্ছি আমি তোমার মনের কথা যে জান্‌তে পেরেছিলুম —কিন্তু আমার অনুরোধ আর একটী বিয়ে করে সংসারী হও, নৈলে খুকুর কষ্ট হবে—তবে যাই খুকু ?

ওপারের মাতব্বরেরা হঠাৎ এ ব্যাপার দেখে হাঁ হাঁ করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে, এসব কি বেহায়াপনা তোমার অবনী ? আমাদের নামটাও ডোবাতে চাও ? দশের মাঝখানে এ ছেলেকে নিয়ে সোহাগ কচ্ছ ?—ওঠোনা বাছা গাড়ীতে, ছোঁড়াকে যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে ?

ভয়ে ভয়ে ইন্দু গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসল। গাড়ীখানা তারপর প্লাটফরম ছেড়ে ছুটে চল্লো। অবনীর চেতনাহীন মর্ম্মস্থলটাকে পিষে দিয়ে।

রাস্তায় যেতে যেতে চোখ মুছে খোকা বললে, ও কে বাবা ?

অবনী ধরাগলায় বললে, তোর মা—

—মা ?

হুঁ—চল্ দাঁড়াস্‌নে—সন্ধ্যে হয়ে এল।

উৎসব

গরুই নদীর শাখার নাম কাজুড়ি। শীত ও গ্রীষ্মে তার শুষ্ক বুক ধূ ধূ করে। বর্ষায় বান ডাকে! আশেপাশের ক্ষেত খামার ভাসাইয়া দিয়া যায়।

তার দক্ষিণ তীরে একখানি ছোট্ট গ্রাম কৈলাস।

শ্রীপতি সেই গ্রামেই বাস করে। তার সম্বলের মধ্যে একখানা খড়ের ছাউনি ঘর ও একটা পঙ্কিল ডোবা,—আর সামান্য কিছু জমি, এবং সংসারে রুগ্ন পত্নী ও ছ'বছরের মুমূর্ষু ছেলেটা।

ছেলের দিকে চাহিয়া নারাণী বলে, কি হবে গো ?

শ্রীপতি মুখ ফিরায়, বলে, কোনও উপায় নেই—

এমনি ক'রে মর্ত্তে বসল, কার মুখ চেয়ে থাকব ? ওই একটিই ত—

তাই রক্ষে, বলিয়া শ্রীপতি সরিয়া যায়।

নারাণী কাঁদে না। রুগ্ন দেহে কাঁদিলে দম আটকায়। বলে, বদ্যির বাড়ী একবার যাবে ?

শ্রীপতি বলে, গিয়ে কি করব ? পয়সার জন্যে কাল তাড়িয়ে দিয়েছে, আজ আবার সাধতে যাব ?

নারাণী এদিকওদিক চাহিয়া বলে, চারটি চাল দিলে ওষুধ দেয় না ?

শ্রীপতি হাসে,—সে হাসি দেখিলে কান্না পায়, ভয়ও হয়। হাসিয়া বলে, চালই বা কোথায় যে দেবে নারাণী ? উপোসটা কি অসুখের জন্যেই ?

নারাণী লজ্জায় সরিয়া যায়।

জমিদারের গোমস্তা আগড় ঠেলিয়া ভিতরে আসে। দেখিয়া শ্রীপতির রক্ত শুকায়, বলে এমন সময় ছোট বাবু ?

কাজ আছে হে, অকাজে কি এসেছি ? তুমি ত একবার চোখের দেখাও দিয়ে আসতে পার না। বলি বাঘ না ভাল্লুক ?

শ্রীপতি বলে, তার জন্যে নয় ছোট বাবু, পয়সা কড়ি না হলে—

কান্তিবাবু বলে, পয়সা কড়ি নেই তা যেন বুঝলুম কিন্তু গাঁয়ে

লাখপতিও কেউ নেই ছিপতি, যে তোমার টাকা কটা না হলে তাদের চলে যাবে—

আজ্ঞে, আপনারা দয়া না করলে কে করবে ?

কান্তিবাবু হো হো করিয়া হাসে, বলে, দয়া। পেটে খেয়ে ত জমিদার তোমায় দয়া করবে। নৈলে দয়া আসবে কোথা থেকে—যাক তোমার হিসেবটা এখন করে দাও—আবার দু'এক ঘরে যেতে হবে ত—

শ্রীপতি দাঁড়াইয়া থাকে।—কান্তিবাবু রাগিয়া বলে, কি, হাঁ করে রইলে যে ? হিসেবটা কর ?

মাথা হেঁট করিয়া শ্রীপতি বলে, ওর আর কি হিসেব কর্ব্ব— দু'সনের দশটাকা ক'আনাই হয়—কিন্তু—

কিন্তু কি ?

হাতে ত নেই—এখন সুবিধে হচ্ছে না—

সুবিধে হচ্ছে না! কি কথাই বললে ? এতক্ষণ ভ্যান ভ্যান করে বকিয়ে শেষে এই কথা!—এই সব পেজোমিতেই ত ভগবান তোমাদের এমনি করে রেখেছেন—

শ্রীপতি কিছু বলে না, চুপ করিয়া থাকে। কান্তিবাবু পুনরায় বলে, কিন্তু এটা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি শ্রীপতি, আজই তোমার দেবার শেষ তারিখ ছিল, তুমি দিলে না। জমিদার বাবু লোক সুবিধে নন্ তাঁর কানে এ কথা উঠলে কি করবেন তা জানিনি—বলিয়া সে চলিয়া যায়।

নারাণী বলে, ছোট বাবুর কথার মানে বুঝলে ত ?

বুঝে কি কর্ব্ব ?

আদায় ওরা কর্ব্বেই—

শ্রীপতি হাসে, বলে—কি আর আছে ? এই রক্ত মাংসের দেহটা,

ছাড়া ত কিছু নেই। —এটা নিলেও বাঁচতুম নারাণী—তাও না—

খাইতে বসিয়া শ্রীপতি বলে, আমায় ভাত দিলে—তোমার কই নারাণী?

নারাণী বলে, আমার সকাল থেকে জ্বর—

খাবার সময়ই জ্বর, এর আগে হয় নি ত? আর কিছু নেই বুঝি?

রুগ্ন ছেলেটা কাঁদে। লোলুপ দৃষ্টিতে ভাতের দিকে চাহিয়া বলে, ওই ভাত দে মা—তোর পায়ে পড়ি—দে—

স্বল্প অন্ধকারে শ্রীপতি ছেলেটার দিকে চায়। অসহ্য ক্ষুধার কাতরতায় সে কদাকার বিকৃত মুখখানা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে।

ছেলেটা আবার কাঁদে, দাও বাবা—ওই গরাসটা ওইটুকু, আর চাইব না—ওই ফ্যানটুকু, তোমার পায়ে পড়ি—

চোখ বুজিয়া শ্রীপতি ছেলের মুখে ভাত তুলিয়া দেয়। ছেলেটা ইতর জন্তুর মত গো-গ্রাসে গেলে। তারপর নিঝুম হইয়া পড়ে।

সেদিন রাতে নারাণী বলিল, খোকার ভাতের সময়কার ছোট হারটি—মনে আছে?

হুঁ—

তাই বেঁচে বদ্যির ওষুধ এনে দাও—

সেটা যে ভাঙ্গতে নেই নারাণী!—

নারাণী ব্যস্ত হইয়া বলিল, ও বাঁচলে আবার কত হবে, এখন ভাল হ'য়ে উঠুক ত—

বেশ—

আজই যাবে?

আজ গেলে ত পাবনা, সন্ধ্যের পর কেউ টাকা দেবেনা!

দর

স্মুখের প্রকাণ্ড মাঠটা প্লাবনে বিধ্বস্ত। হাঁটু অবধি কাদা। তাহাই ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। শ্রীপতি তাড়াতাড়ি যাইতেছিল।

পিছন হইতে শব্দ আসিল, নজরে পড়ে না নাকি ?

শ্রীপতি ফিরিয়া দেখিল, বলিল, ছোটবাবু প্রণাম হই। ছেলেটার বাড়াবাড়ি তাই ওষুধ আনতে—

অসুখ ত আছেই গো কিন্তু খড়ের ছাউনির খাজনা খতম কল্লে কেন ? জমিদার কি ভাল মানুষ ?

শ্রীপতি চুপ করিয়া রহিল। কান্তিবাবু পুনরায় বলিল, আজ একবার তোমার জমিদার বাবুর কাছে যেতে হবে, এক্ষুনি—

শ্রীপতি বিনয় করিয়া বলিল, ছেলেটাকে একটু ওষুধ না দিয়ে কি করে যাই ছোটবাবু ? তা ছাড়া গিয়েই বা কি কর্ব্ব, এখন ত হাতে কিছু নেই—

আমি তার কি বলব। কিন্তু ডেকেছেন যখন তখন যাওয়াই বুদ্ধির কাজ। লোক ত সুবিধের নন, তা ত জানই। কি কর্ব্বে ?

চলুন তবে, বলিয়া শ্রীপতি অগ্রসর হইয়া চলিল।

সদর বৈঠকখানায় কর্ত্তাদের মজলিস বসিয়াছিল। কান্তিবাবু তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, এদের জ্বালায় আমি ত আর পারিনে বাবু, হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। পাওনা গণ্ডা দেবার নাম নেই—

বৈঠকখানায় রসচর্চ্চা হইতেছিল। রসভঙ্গ হওয়াতে বাবু চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, কান ধরে বেটাকে আমার কাছে নিয়ে এলেনা কেন ?

এ অধীন তাই করেছে বাবু—

বাবু বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, তোমার ব্যাপার কি ছিপতি, জমিদার বলেও কি সরম নেই ?

শ্রীপতি হেঁট হইয়া বলিল, আপনি মা বাপ অমন কথা বলবেন না।

ও কথার কথা। ওসব ছেড়ে দাও। বলি আমার দশটা টাকা কি তোমার হাতের তলা দিয়ে গলতে দেবে না! দু বারের ফসলের টাকাও বেমালুম গাপ করলে—

শ্রীপতি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, একথা কে বললে বাবু ?

আগুন কি চাপা থাকে ছিপতি, তা থাকে না, ও'ই কান্তিই ত দাঁড়িয়ে রয়েছে, ও ত আর আমায় মিথ্যে বলবে না ?

উত্তরে শ্রীপতি কান্তিবাবুর মুখের দিকে নিমেষমাত্র চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, এ খবর সত্যি নয় বাবু, ভগবান জানেন—

কান্তিবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ভগবান! এদেশে ভগবানের হাত নেই শ্রীপতি, এ তাঁর রাজত্বের বাইরে, বলিতে বলিতে আবার উষ্ণ হইয়া বলিলেন, তুমি কি কিছুই করনি ? আগের ফসল বেচে তুমি যে ঘরের চাল তুললে, ওলাইচণ্ডীর চাঁদা দিলে, ডোবা কাটালে এ সব কি মিথ্যে খবর ছিপতি ? আমায় বাবুর সামনে মিথ্যেবাদী বল তুমি—বাবু দেবতা—তিনি কারো কান-ভাঙ্গানী শোনেন না—

বাবু বলিলেন, ঘরের চাল তুলতে কত খরচ পড়েছিল ছিপতি ? না তা নয়, এখন বেচলে কত উঠতে পারে ?

শ্রীপতির বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, তা কি করে জানব বাবু ? ওটুকু বেচবার কথা ত ভাবিনি, আমার ছেলেটি বড় হয়ে—

কান্তিবাবু ধমক দিয়া বলিল, বাবু ত তোমায় সে কথা জিজ্ঞেস করেন নি। বেচলে কত হতে পারে তাই বলচেন।

শ্রীপতি বলিল, খরচ পড়েছিল দুকুড়ি টাকা—

বাবু বললেন, তা হবে বৈ কি, মাগ্যির বাজার। আমার ছোট মহল্লার নতুন ধাওড়া দেখেছ ছিপতি ?

আজ্ঞে হাঁ—

ওইটে শেষ হলে তোমাদের থাকবার জায়গা করে দেবো। ফসলের জন্যেই ওটা হয়েছিল কিন্তু এখন যে মতলব আর নেই। তবে একটা কথা—

শ্রীপতি মুখ তুলিল।

কান্তিবাবু বলিল, আমিই বলচি,. বাবুর আমার শরীরটা একটু অসুস্থ আছে। আপাততঃ তোমার ঘরখানা ছেড়ে দিতে হবে, কেন না সরকারে টাকা আমাদের এ মাসে জমা দিতেই হবে, যে উপায়েই হ'ক।

শ্রীপতি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, সে কি কথা বাবু, ছেলে বউ নিয়ে তবে দাঁড়াব কোথা ?

বাবু বলিলেন, তোমার মনটাই ভাল নয়, ছিপতি। কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়, তা শেখোনি। ওই কথা পাছে শুনতে হয় বলেই আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে আগে থাকতে ধাওড়া করে দিচ্ছি।

কান্তিবাবু বলিল, দুর্ভাগ্য, আপনার দুর্ভাগ্য ! নৈলে এমন প্রজাই বা আপনাকে চরাতে হবে কেন। তা বেশ ওই কথাই রইল ছিপতি। ঘরখানা তোমার খালি করে দিও। তারপর বাবুর চালা তৈরী হলেই সেখানে রাজার হালে থাকতে পারবে, বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল, এ কষ্টটুকুও তোমায় কর্ত্তে হত না, যদি তুমি দশটা টাকার মায়া

ছাড়তে—যাক্ তা যখন হবার নয়, আর আমাদের টাকার এত আবশ্যক তখন ওই কথাই রইল—আসুন বাবু আপনার আবার ঠিক সময় স্নানাহার না হলে অম্বলের ব্যামো বাড়বে, বলিয়া সে সরিয়া গেল।

বাবু আর একবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আর একটা কথা বলছিলুম ছিপতি—আমার নাতির অন্নপ্রাশন, তা শুনেছ বোধ হয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কালকেই ত হবে—

—সেই কথাই বলছিলুম। এ গাঁয়ের সকলেই সাধ্যমত যা হক কিছু যৌতুক দিয়েছে। কেবল তুমিই দেখছি আমার মানহানি করবে—

শ্রীপতি বলিল, আপনাকে দেবার মতন আমার কি আছে বাবু ?

তাহার চোখে জল আসিতেছিল।

—দেবার ইচ্ছে থাকলেই দেওয়া যায় ছিপতি। সাত দেবতার দোর ধ'রে নাতিটি হল, তুমিই বা কোন মুখে ছেলের বাপ হয়ে চুপ করে আছ ?

অন্তরাল হইতে সরিয়া আসিয়া কান্তিবাবু বলিল, পয়সার অহঙ্কার বেশী দিন থাকে না, ছিপতি। আজ যে রাজা কাল সে ভিখিরী। জমিদার বংশের ছেলেটি হল আর তুমি সিন্দুক বন্ধ করে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলে। আমাদের নেই, তাই বাবু মাপ কল্লেন—থাক্‌লে আমরাও চুপ করে রইতুম না।

শ্রীপতি মুখ তুলিল না।

বাবু বলিলেন, সকলের সঙ্গে তোমার যখন ডাক পড়বে, তখন লজ্জায় আমি মুখ তুলতেই পারব না, বাইরের শত্রুরা মুখ টিপে হাসবে—

কান্তিবাবু বলিল, তাই ত,—সকলেই বলবে একটা চাষার ছেলে

হয়ে ছিপতি বাবুকে অপমান কল্লে, তা হলে আপনিই কি আর বাইরে মুখ দেখাতে পারবেন বাবু ?

শ্রীপতি মুখ তুলিল। তারপর গলা ঝাড়িয়া বলিল, ছোটবাবু মন্দ বলেন নি—বেশ, আপনার অপমান যাতে হয় এমন কাজ কর্ত্তে পারব না বাবু। এই ক্ষুদ কুঁড়োটুকু যা আমার ছিল দিয়ে গেলুম। আমার দাদাভায়ের গলায় পরিয়ে দেবেন—বলিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে তাহারই ছেলের অন্নপ্রাশনের ছোট্ট হারটি বাহির করিয়া বাবুর পায়ের কাছে রাখিল। পরে বলিল, আশ্চর্য্য হবেন না ছোটবাবু, আমরা ছোট-লোক হলেও বাবুর মান অপমান বুঝি—আচ্ছা আজ তবে আসি বাবু, বলিয়া উভয়ের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া সে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

কান্তিবাবু হারটি তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, দেখলেন ত বাবু—এক কথায় যে হারছড়া দিয়ে যেতে পারে, তার সিন্দুক ত কুবেরের ভাঁড়ার। তা সে যাই হোক বাবু, আপনার এবারকার দায় কিন্তু এদের পয়সাতেই উদ্ধার হয়ে যাবে, বাবু বলিলেন, তুমি ঠিক বুঝতে পাল্লেনা, কিন্তু ছিপতি তোমায় অপমান করেই গেল—

কান্তিবাবু—হিহি করিয়া হাসিল, বলিল, বুঝতে কি আর পারিনি বাবু—সব বুঝেছি, কিন্তু আমি বলে রাখছি, দেখে নেবেন—কাল মাগ-ছেলে নিয়ে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে তখন ও বিষটুকুও আর থাকবে না। আজ তবে আসি বাবু, বলিয়া একটু একটু হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

সারাদিন শ্রীপতি ঘরে ফিরিল না। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে

না পারিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিল। অন্ধকারে যখন রাস্তাও আর ঠাহর হইল না, তখন আস্তে আস্তে আগড় সরাইয়া উঠানে আসিয়া ডাকিল, নারাণী ?

ভিতর হইতে নারাণী বলিল, যাই—

আলোকে নারাণীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীপতি বলিল, খোকা ত ভাত খেয়ে একটু ভালই আছে নারাণী ?

ভগ্নকণ্ঠে নারাণী বলিল, দেখবে চল।

শ্রীপতি বলিল, আর কি সাড়াও দিচ্ছে না ?

—না, ওষুধটা খাইয়ে দাও—

—ওষুধ, শ্রীপতির বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, বলিল, ওষুধ ত নেই নারাণী ? সে হারটা বাবুর নাত্তির ভাতে যৌতুক দিয়ে এলুম—

—কি বললে ?

শ্রীপতি বলিল, আমরা পেরজা হয়ে বাবুর অপমান ত সইতে পারিনি —তাই দিয়ে এলুম।

নারাণী আস্তে আস্তে বলিল, ছেলে ত সকলেরই সমান—তাদের একটু মায়াও হল না ?

—জমিদারী কর্ত্তে গেলে যে দয়ামায়া ত্যাগ কর্ত্তে হয় নারাণী !

নারাণী বাহিরে আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, তারপর মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিয়া বলিল, ভগবান, তুমি সব জানো। তোমার কাছে কেউ তফাৎ নয়—তুমি দেখো—

ভোরের আলো ফুটিবার পূর্ব্বেই ছেলেটা মরিয়া গেল।

শ্রীপতি কুড়াল খানা লইয়া বাহিরে আসিল এবং যে গাছটার শুক্‌নো গুঁড়িটার উপর ছেলেটা খেলা করিতে করিতে চড়িয়া বসিত,

সেইটাই চেলা করিয়া কাটিয়া কাঠ জড়ো করিল। পরে ডোবাটার ওধারে একটি ছোট্ট চিতা প্রস্তুত করিয়া শবদেহটাকে তাহাতে তুলিয়া দিল।

একটু পরে আগড় সরাইয়া কান্তিবাবু বলিল, কখন মারা গেল ছিপতি ?

—খানিক আগে ছোট বাবু—

—আহা ছেলেটি বড় ভাল ছিল। কেমন নেচে কুঁদে বেড়াত। ঐ গাছটিতে যখন তখন চড়ে ব'সে—ওকি গাছটি কি হল ছিপতি ?

—কেটেছি ছোটবাবু, তাইতে চুলো করিছি।

ভাল করনি ছিপতি, বাস্তুবৃক্ষ! ওই ত লক্ষ্মী, ও গাছ কেটে জমিদারেরই বেশী অমঙ্গল কল্লে। এ পাপ ত অমনি যাবে না। এতে গাঁয়ের পতন নিশ্চয়—তোমার, আমার; জমিদারের, সকলের পতন—

শ্রীপতি নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল।

আড়চোখে চাহিয়া কান্তিবাবু পুনরায় বলিল, কেঁদোনা—কাঁদলে ত আর ফিরে পাবার নয়, গাছের সব ফল কি থাকে বাপু, একটা নষ্ট হয়েও যায়।

ভগ্নস্বরে শ্রীপতি বলিল, আমার যে সব গেল ছোটবাবু!

—চুপ কর, চুপ কর—চোখের জল ফেলো না। আজ এ গাঁয়ের এত বড় একটি শুভ অন্নপ্রাশনের উৎসব; শহর থেকে ভাল ভাল বাইজি এসেছে, তাদের নাচ গান—এত বড় একটা ভোজ, এতে চোখের জল ফেলে বিঘ্ন ঘটিয়োনা ছিপতি—বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল, বাস্তুবৃক্ষ নষ্ট করে যে পাপ কল্লে—এ তো খণ্ডাবার নয়—কি করবে ছিপতি ?

—অপরাধ হয়েছে ছোটবাবু—

—সে ত বটেই কিন্তু ও কথা বললে কি বাবু শুনবেন, না শাস্ত্রই তোমায় রেহাই দেবে ?

—আজ্ঞে করুন, কি কর্ব্ব, আপনি ব্রাহ্মণ।

—করবার ত কিছুই দেখতে পাইনি—কেবল একটি উপায় ঠাওরাতে পারি। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ, বস্ত্র, নৈবেদ্য আর দক্ষিণা দিলে এ পাপের কিঞ্চিৎ লাঘব হতে পারে—সেজন্যে তোমায় একটি যাগ্ কর্ত্তে হবে—

শ্রীপতি চুপ করিয়া রহিল।

কান্তিবাবু আবার বলিল, মুখ বুজে থাকলে হবে না ছিপতি—এ প্রাচিত্তির তোমায় কর্ত্তেই হবে। জমিদারের অপমান যখন সইতে পার না, তখন তাঁর অধঃপতনই বা কোন্ প্রাণে সহ্য করবে ? ওরে বাবা, বাস্তু বৃক্ষ ! হে ভগবান, তুমি এ পাতকীকে ক্ষমা ক'র—কি সর্ব্বনাশ !

সে চলিয়া গেল।

শীতের বেলা পড়িয়া আসিল। অদূরে শুভ উৎসবের বাজনা শুনা যাইতেছিল।

শ্রীপতি ডাকিল, নারাণী ? সাড়া নাই। আবার ডাকিল। তারপর গভীর স্নেহে নারাণীর হাত দুইটি ধরিয়া বাহিরে আসিল। ডোবাতে স্নান করাইল,—নিজেও করিল। নারাণী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, বসতে যে পাচ্ছিনি—ঘরে চল। বলিয়া সে সেইখানে শুইয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে শ্রীপতি বলিল, ঘর ত আর নেই নারাণী—সব গেছে—তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা যাক্, এ পোড়া গাঁয়ে আর থাকব না—চল আজই

আমরা চলে যাই। শহরে গিয়ে খেটে খাব—বলিয়া সে নারাণীর হাত ধরিয়া তুলিল।

চিতাটা তখনও অল্প অল্প জ্বলিতে ছিল।

নারাণী বলিল, ওটাতে জল দিয়ে যাও—

—না জ্বলুক—সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হক—চল—

—সঙ্গে কিছু নেবে না?

শ্রীপতি বলিল, না সব থাক, ছোটবাবু প্রাচিত্তির করবে—ওসব তার দক্ষিণে—চল—

*　　　　*　　　　*

অনেকদূর গিয়া নারাণী বলিল, পারিনা যে, আর কতদূর—রাত যে অনেক হল?

শ্রীপতি বলিল, ময়নাবতীর মাঠ ছ'কোশ—তারপর ফাঁড়ি—সেখানে জিজ্ঞেস কল্লে রাস্তা ঠিক পাব—চল লক্ষ্মীটি।

আলেয়া

পড়ো জমিটার ধারে একতলা বাড়ীখানা—তারের জাল দিয়ে ঘেরা কাক-কোকিল ঢুকিবার উপায় নাই। রাস্তার সমতা থেকে নীচু, সুতরাং বৃষ্টি হইলে ভিতরে জল জমে। লোকগুলা মাছের মত ভাসিয়া বেড়ায়।

লোকে বলে, বাড়ী নয় ত খাঁচা। আরও কত কি বলে।

দিন-রাত ভিতরে হরিনাম হয়। চীৎকারে কান ঝালাপালা করে। কানাঘুষা হয়, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

পাশের বাড়ীতে যে মেয়েটার সেদিন বিবাহ হইয়াছে সে ইহার চেয়েও আরও কি একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল।

বৈষ্ণবী সে কথার উত্তর দেয় নাই—কিই বা দিবে! কেবল বলিয়াছিল, রাগ কর কেন ভাই, বামুনেরা ত নাস্তিক নয়।

মেয়েটা ছাদের পাঁচিলে একটুখানি মুখ বাড়াইয়া বলে, তোমার সাধ আহ্লাদ কিছু নেই গা? কেবল ওই 'ভজ নিতাই গৌর'? বলিয়া বৈষ্ণবীর বেশ-বিন্যাস দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসে।

বৈষ্ণবী বলে, সাধ আহ্লাদ আর কি ভাই। উনি বলেন, নামের মধ্যে ওসব ডুবে যায়—বলিয়াই একটু হাসে। সাহস করিয়া আবার বলে, তুমিও জপ কর না ভাই, দিন-রাত কর—দেখবে মনটি কেমন ফুর্ ফুর্ করবে—

মেয়েটা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে, বলে, দূর—লোকে বলবে কি? বলিয়া চলিয়া যায়।

আবার আসে। বলে, তোমার নাম ত বোষ্টুমী, আর নাম নেই বুঝি?

বৈষ্ণবী একটু ভাবে, তারপর হাসিয়া বলে, আছে, তবে সে নামে কেউ ডাকে না—বলিয়া সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলে, শুনে হাসবে না? আমার নাম লীলা।

মেয়েটার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়। চোখে চোখে চাহিয়া বলে, ওই দাড়ীওয়ালা বুড়োটা কে?

বৈষ্ণবী একটু চুপ করিয়া থাকে। তারপর বলে, উনিই ত—বলিয়া চঞ্চল পদে চলিয়া যায়, আর আসে না।

লোকের ভিড় লাগিয়া আছে। সদাসর্ব্বদাই কীর্ত্তন চলে। সরু দালানটার উপর তাহারা ধুম্ ধুম্ করিয়া নাচে।

বৈষ্ণবীও নাকি ঘরের ভিতর নাচে, কিন্তু কেউ দেখিতে পায় না।

দলের মধ্যে মতিরামের সাধনা অদ্ভুত। নাচ গান করিতে করিতে সে প্রায়ই আছাড় খাইয়া পড়ে। কখনও হাসে কখনও কাঁদে—চোখ দিয়া ধারা গড়ায়। সকলে বলে, ওর ওপর 'ভর' হয়েছে, ঠাকুরের দয়া—আহা!

রাধানাথ এ কথা শুনিয়া আড়ালে গিয়া হাসে। লীলা জানালার ফাঁক দিয়া তাহার হাসি দেখিতে পায়।

রাধানাথের সহিত কথা কহিতে তার একটুও লজ্জা করে না। জানালাটা আর একটু ফাঁক করিয়া বলে, হাসচেন যে?

রাধানাথ মুখ ফিরাইয়া বলে, হাসি আসে তাই—এতদিন হরিনাম কচ্ছি কিন্তু আমাদের ওপর ঠাকুরের দয়া নেই—বলিয়া আবার হাসে।

চোখ পাকাইয়া লীলা বলে, দয়া হবে কোত্থেকে? অবিশ্বাসী মন নিয়ে কি নাম করা যায়? কথায় বলে, 'মনে মুখে এক হও।'

রাধানাথ মুখ ফিরায়। আবার বলে, তোমার বিশ্বাস আছে ত?

খুব আছে, তোমাদের চেয়ে—বলিয়া লীলা আড়ালে সরিয়া যায়।

আবার খানিক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসে। মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া বলে, নাচুনি আরম্ভ হয়েছে—এখানে দাঁড়িয়ে যে?

রাধানাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, এমনি—বুড়ো বয়েসে আর নাচতে ভাল লাগে না।

লীলা হাসিয়া ফেলে কিন্তু নিজের হাসিতে লজ্জিত হইয়া ঘাড় ফিরায়। তারপর বলে, বিষ্টুবাবু আবার হাউ হাউ ক'রে কাঁদে—

ঠোঁট উল্টাইয়া রাধানাথ বলে, নামের মাহাত্ম্য! আমার কই চোখে জল আসে না—তোমার ?

রামো—ওসব আদিখ্যেতা—বলিয়া লীলা চলিয়া যায়।

রাধানাথ উঁকি মারিয়া লীলার পথের দিকে চায়। কিন্তু লীলা আসে না।

সন্ধ্যার পর সকলে চলিয়া যায়। রাধানাথ যায় না। তাহার উপর বাবাজির কৃপাটা একটু বেশী।

ধূনুচিতে ধূনা দিয়াই তিনি বলেন, কোথায় গেলে গো ? রাধুর বসবার আসনটা এগিয়ে দাও না—

থাক্ থাক্, আর আন্‌তে হবে না—রাধানাথ বলে।

কিন্তু লীলা আসন আনে। বাঁ হাতের আঙুল কয়টা দিয়া মুখের হাসি টিপিয়া ধরিয়া বলে, এই যে পেতে দিচ্ছি—

রাধানাথও আড়চোখে চাহিয়া হাসে। বিনা কারণেই হাসি।

লীলা আসন পাতিয়া দেয়। তারপর রাধানাথের সুমুখ দিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যায়—যেন ছুঁইয়া না ফেলে।

বাবাজি পিছন ফিরিয়া তখন মন্ত্র জপেন।

দরজার আড়ালে গিয়া লীলা বসিয়া পড়ে। রাধানাথ দেখিতে পায়। বাবাজি মুখ ফিরাইয়া বলেন, দোষ নেই বাবাজি—গুরুপত্নীর সঙ্গে কথা চল্‌তে পারে, আমাদের শাস্তরে বাধে না—

লীলা মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসে। রাধানাথ বিনয় করিয়া বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু তাই বলে কি সকলেই কথা বল্‌তে পারে ?—

তা নয়। তবে আমি তোমাকে চিনি কি না—সেই ছোট্ট বেলাটি থেকে—বলিয়া গুরুদেব চুপ করেন। একটু পরে আবার বলেন, কিন্তু

মা বলতে হবে না বাবা—ওটা যেন জোর ক'রে সাধুগিরি দেখানো। আর উনি তোমার চেয়ে বয়েসেও বোধ হয় ছোট—ছুটি ভাই বোনের সামিল। তুমি দিদি বলেই ডেকো—

রাধানাথ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে। মুখ তোলে না পাছে লীলার সঙ্গে চোখচোখি হয়। কানাচের ধারে একটা বিড়াল ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকে। পাশের আস্তাবলে ঘোড়ার ক্ষুরের ঠকঠক্ শব্দ হয়। স্যাকরাদের ঘড়িতে টিং টিং করিয়া নয়টা বাজে।

রাধানাথ বলে, আমি উঠি এইবার—

উঠবে? আচ্ছা এসো—বাবাজি বলেন।

রাধানাথ আর কোনও দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া যায়। দরজার কাছে গিয়া বলে, কাল সকাল সকাল আসব গুরুদেব—

লীলা আপন মনে হাসে।

কদম ফুলের মত মাথাটি ছাঁটা—কাঁচায় পাকায় চুল। গায়ের রং কালো—দেহটিও নাদুস নুদুস। দাড়িটা ঠিক সজারুর পিঠের মত—সাত জন্মে ক্ষুর পড়ে না। চোখ ছুটি দেখিয়া ত লীলা ভয় পাইয়া গিয়াছিল। একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল, নামাবলীখানা গায়ে না থাকলে লোকে ডাকাত বলত—

খুঁ-খুঁ করিয়া বাবাজি সেদিন হাসিতে হাসিতে লীলার চিবুক ধরিয়া বলিয়াছিলেন, রাধুর চেয়েও দেখতে ভাল ছিলুম—বুঝলে?

লীলা আর কিছু বলে নাই। কিন্তু বিশ্বাসও করে নাই।

পাশের বাড়ীর মেয়েটা প্রায় রোজই বিকাল বেলা ছাদে আসিয়া দাঁড়ায়। আজও দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বলিল, শুনচ অ-দিদি।

সরিয়া আসিয়া লীলা বলিল, কি ভাই?

ডুমুর ফুল নাকি?—দেখতে পাই নে কেন?

অনেক কাজ কি না—

মেয়েটি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, জানি গো জানি কত কাজ—তুমিটি আর আমিটি এই ত—সেই রাধু বাবুও থাকে বুঝি?

দূর, সে থাকতে যাবে কেন? তারপর—এত সাজ-গোছ যে? লীলা বলিল।

মেয়েটা একটু হাসিয়া বলিল, তুমিই বা কি কম যাও ঠাকরুণ—চুল আঁচড়েছ, সাবানও মেখেছ, অমন কালাপেড়ে সাড়ীখানি, পায়ে আল্‌তা, ওকি গলার কণ্ঠি কি হল?

অপ্রস্তুত হইয়া লীলা বলিল, ছিঁড়ে ফেলেচি ভাই, ভাল লাগে না—

বিচ্ছিরি দেখায়, না? বলিয়া মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিল। তারপর বলিল, শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি—

মুখ তুলিয়া লীলা বলিল, সত্যি, আবার কবে আসবে?

মেয়েটা কি একটা তামাসার কথা বলিল। বলিয়া চলিয়া গেল।

চোখের উপর আবার সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসে। ঘরে আলো জ্বালা হয় না। না হ'ক—সংসারে অত দরদ কিসের? নিত্য এ সন্ধ্যা-জ্বালা, নিত্য ঠাকুরের সেবা—আরতি—সবই প্রাণহীন! কেন এ সব!

বাবাজি ডাকেন, শুন্‌চ—ওগো—

লীলা কাছে গিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়ায়। বাবাজি ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে বলেন, কাল সকাল-সন্ধ্যে হরিনাম হবে—জান ত?

—না, বলিয়া একটু থামিয়া লীলা পুনরায় বলিল, এখন কিছুদিন বন্ধ থাক—আমি বলি—

বাবাজি ভুরু উঁচু করিয়া বলিলেন, কেন ?

তবে হ'ক—বলিয়া লীলা বাহির হইয়া গেন।

রাধানাথ আসিয়া হাজির। বাবাজি বলিলেন, শুনচ বাবু—তোমার দিদিটি কি বলে ?

চৌকাঠের উপর বসিয়া রাধানাথ বলিল, কি ?

বলে, হরিনাম বন্ধ থাক। চুপ ক'রে রইলে যে ? শিউরে ওঠবার কথা এ—

বাবাজির গোল গোল চোখ দুইটা বড় হইয়া ওঠে।

রাধানাথ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না। 'পদাবলী'খানা লইয়া নাড়াচাড়া করে। তারপর বলে, না হয় বন্ধ করেই দিন—

বাবাজি বলিলেন, দিদির মন্তর কানে গেল বুঝি ? তোমার দিদিটি বেশ—বলিয়া হিহি করিয়া হাসেন। পুরু ঠোঁটের ভিতর হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়ে।

রাধানাথ কিন্তু হাসে না ? বরং তার মুখ কালো হইয়া উঠে। দরজার আড়ালে সাড়ীর আঁচলটুকুর দিকে মুখ তুলিতে ভয় করে।

বাবাজি আবার বলিলেন, বন্ধ হবে, কিন্তু বুঝলে রাধু—হরিনামে কি পেট ভরে ? কাল বেজায় পাওনার হুল্লোড় যে—দুফোঁটা চোখের জলেই কেল্লা ফতে—ব'স, আসছি—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সুমুখের দরজাটি একটু ফাঁক হয়। লীলা উঁকি মারিয়া বলে, চলে গেছেন !

হুঁ ! রাধানাথ বলে। বলিয়া এ-দিক ও-দিক চায়। আমি আপনার কানে মন্তর দিয়েছি, না ?

কে বললে ?

লীলা বলিল, না তাই বলছি—বাড়ী যাবেন না? রাত হয় নি বুঝি?

হলেই বা জলে পড়ে নেই ত—রাধানাথ বলিল। মুখের হাসি লুকানো যায় না।

লীলা এ-দিক ও-দিক চায়। তারপর বলে, উনি নাকি আগে সুন্দর ছিলেন?

বিশ্বাস হয় না বুঝি?

বিশ্বাস কল্লেই হয়—লীলা বলে। বলিয়াই বাহিরের দিকে চায়। কিন্তু কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতের হাওয়ায় গা শির্ শির্ করিয়া ওঠে। রাধানাথ গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল্লুম—

এরই মধ্যে? রাত ত হয় নি—লীলা বলিল।

কিন্তু রাধানাথ পা বাড়াইয়া বলে, যাই আস্তে আস্তে—

কাল কখন আসা হবে? বলিয়া লীলা আলো হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া যায়।

দুয়ারের কাছে গিয়া রাধানাথ হাসিয়া ফেলে, বলে, আমার সব খবরই কি তোমায় দিতে হবে?

লীলা আবার পিছন ফিরিয়া চায়। তারপর বলে, দিলেই বা—পর ত নই—বলিয়া মুখ নীচু করে। নিঃশ্বাসটা চাপিয়া রাখে।

রাধানাথ কি বলিতে যায়—পারে না। শুধু বলে, আচ্ছা। বলিয়া চলিয়া যায়।

সকালে সোরগোল শুরু হয়। নানা ঢঙের কীর্ত্তনীয়া আসিয়া নানা কসরৎ দেখায়।

রাধানাথের মন যায় না। আড়ে আড়ে ঘরের ভিতর চায়। আবার খঞ্জনী বাজায়।

লীলা জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া ডাকে। রাধানাথ থুথু ফেলিবার নাম করিয়া উঠিয়া কাছে আসে।

লীলা বলে, রোজ রোজ তোমার ভাল লাগে ?—আমার লাগে না।

বাবাজি রাগ করেন যে না এলে—রাধানাথ বলে।

লীলা বলে, তা বললে কি হয় ? মানুষের মন ত—চেঁচানির, চোটে বাড়ী ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে। ওই যে ওই আরম্ভ হল, বাবারে—

রাধানাথ চলিয়া যাইতে চায়। কিন্তু লীলা বাধা দিয়া বলে, থাক্ —একটু পরেই হবে, না হয় বাড়ী চলে যাও—এখানে থেকে কাজ নেই। নয় ত এই ঘরে এসে ব'স—

না—না—উনি হয় ত দেখতে পাবেন। এবং আরও কি গোঁজ গোঁজ করিয়া বলে। মুখখানা লাল হইয়া ওঠে।

রাধানাথ বলে, দেখতে পেলেই বা, তাতে কি ? লজ্জা করে বুঝি ?

লীলা সে কথার উত্তর দেয় না। একটু পরে বলে, নাকের ওই তেলক মুছে ফেল'—টিকিই বা রাখবার দরকার কি ? বুড়োর বেহদ্দ !

রাধানাথ আর হাসি চাপিতে পারে না, বলে, মানায় না বুঝি ?

জোরে ঘাড় নাড়িয়া লীলা বলে, না—বিচ্ছিরি দেখায়।

আবার হাসি আসে। রাধানাথ বলে, কি কল্লে তোমার পছন্দ হয় ?

দূর, আমার আবার পছন্দ—বলিয়াই লীলা কপাটের পাশে লুকায়।

লোহার গরাদে মুখ লাগাইয়া রাধানাথ বলে, বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে বুঝি, আমাকেও লজ্জা ?

লীলা আর একটু সরিয়া যায়। বলে, যাও আমি জানি নি। এবং আরও একটা কথা বলে, তোমার বউকে জিজ্ঞেস করগে—

বাবাজির পরণে বেনারসী জোড়। হাতে সোনার বালা। চন্দন-চর্চ্চিত ললাট। সময় সময় চোখে কাজলও লাগান। মাথায় জরির তাজ ত আছেই।

তাঁর গানের সঙ্গে দোয়ারেরাও চীৎকার করে। গলার শিরগুলা ফুলিয়া ওঠে।

আড়াল হইতে দেখিয়া লীলার সর্ব্বাঙ্গ রি রি করে।

রাধানাথও হাসি চাপিতে পারে না। সময় সময় বাবাজির নজরে পড়িয়া যায়। হাতের দিকে চাহিয়া বলেন, তাল কেটে যাচ্ছে হে রাধু—

আড়ালে দাঁড়াইয়া ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া লীলা বলে, যাবে না? সব তাল বেতালের দল যে—বলিয়া দুম দুম করিয়া চলিয়া যায়। রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, হরি-কথায় সকলের নাল গড়িয়ে পড়ে। অত করে হাত নেড়ে ডাকলুম, আসা হ'ল না—

বেলা গড়াইয়া আসে। সোরগোল থামিয়া যায়। সকলে ঘরে ফেরে। বাবাজি ভিতরে আসিলে লীলা বলে, না খাইয়ে অমনি ছেড়ে দিলে?

কাকে?

ওই ইয়েকে—লীলা বলে।

বাবাজি বুঝিতে পারেন। বলেন, কে—রাধু? ও ত চলেই গেল—বলিয়া রেজ্‌কিগুলা গুণিয়া গুণিয়া টাকায় পরিণত করেন। লীলা

চোখ পাকাইয়া চাহিয়া চলিয়া যায়। যাইবার সময় বলে, কেন খেয়ে গেলেই হ'ত—এত করে রাঁধলুম—

বাবাজি হাসিয়া বলেন, পরের ওপর এত দরদ—বেশ দিদি বটে—

দরদ না ছাই, যা নয় তাই বলা—আপন মনে লীলা বলে।

বাবাজি বিষয়কর্ম্মে বাহির হইয়াছিলেন। ঢু একজন তামাক খাইতে আসিয়াছিল কিন্তু কল্‌কে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

রাধানাথ তামাকও খায় না। তবু আসা চাই। ঠাকুর-ঘরে তাহার অবাধ প্রবেশ।

লীলা চৌকাঠে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি বেরিয়ে গেছেন—

তা ত জানি—তুমি তাড়িয়ে দেবে নাকি ?

আমার দায় পড়েছে! একলাই থাকবে ? আমি রাঁধতে যাচ্ছি।

যাও, দোকলা আর পাব কোথায় ?

লীলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

আবার ঘুরিয়া আসিল। কথা বলা চাই। একটু থামিয়া বলিল, তোমার বিয়ে হচ্ছে নাকি ?

কে বললে ?

শুনলুম—তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি।

রাধানাথও হটিবার পাত্র নয়। বলিল, যাদের এত আপনার লোক তার বিয়ে দরকার কি ?

লীলা বলিল, আমি আবার আপনার লোক কিসের ? এমন ত কত আছে।

এমন একজনও নেই—সত্যি বলছি।

আমার ভাগ্যি।

রাধানাথও হাসিয়া বলিল, আমারও ভাগ্যি, নৈলে এমন মিষ্টি কথা শোনায় কে!

—মিষ্টি কথায়ও আর পেট ভরে না—লীলা হাসিয়া বলিল।

বাবাজি আসিয়া পড়িলেন। রাধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, দিদির সঙ্গে আলাপ হচ্ছে বুঝি? বেশ বেশ—

লজ্জায় রাগে লীলা চুপ করিয়া রহিল।

বাবাজি পা ধুইয়া ঘরে আসিয়া বলিলেন, দিদির মতন একটি সোন্দর মেয়ে বিয়ে কর-না রাধু?

রাধানাথ বলিল, কি যে বলেন আপনি—

ঠিক কথাই বলি হে। আমারও একদিন অমন ছিল। আজই না হয় অর্থ পেয়ে অনর্থ ঘটেছে। কামিনী বড় আরামের চীজ বাবাজি—বুড়ো বয়েসেও ধাক্কা দেয়—বলিয়া হি হি করিয়া হাসিলেন।

সিঁড়ির কাছে আসিতেই রাধুর গায়ে একটা টিপ দিয়া লীলা বলিল, আমার মতন মেয়ে পেলে বিয়ে কর না কি?

রাধানাথ থমকিয়া দাঁড়ায়। তারপর লীলা অতি নিকটে আসিলে চুপি চুপি বলে, তোমার মতন—তুমি ত আর নও?

যাও—বলিয়া লীলা হাসিয়া চলিয়া যায়।

ক'দিন আর কীর্ত্তন বসে না। রাধানাথেরও দেখা নাই। কেন আসে না. তা লীলা ভাবিয়াই পায় না। সে বলে তপিলের জোর আছে বুঝি?

বাবাজি হাসিয়া বলেন, আছেই ত—পয়সার রস না থাকলে শুধু হরি ভাল লাগে ?

লীলা বলে, লোকজন এলে গেলে মনটা ভাল থাকে—

বাবাজি আড়চোখে চাহিয়া বলেন, রাধুর জন্যে বুঝি মন খারাপ। তা ত হবেই, ভায়েরও বাড়া—

রাধু—রাধু—কেবল রাধুর নাম। খাইতে শুইতে কেবল রাধানাথ বাবু। কান ঝালাপালা হইয়া যায়।

বাবাজি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলেন, দরদ বড় বালাই—

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলে, ষাট ষাট, আমি কি তাকে বালাই বলছি ?

বাবাজি পুরু ঠোঁট বাঁকাইয়া বল্লেন, বাবা—এত দরদ! মায়ের পেটের দিদিও এমন হয় না।

লীলা বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ দিদি—দিদি—কেবলই দিদি! তিনি আমার বয়েসে বড় তা জান ?

বাবাজি থতমত খাইয়া বলেন, না তাই বলছি—বুঝলে ?—ও একই কথা। তবে সে কি বলবে তাই ভাবচি—

বাবাজির রকম দেখিয়া লীলা হাসিয়া ফেলে। বলে, দিদি বলবার কি দরকার ? আপনি বল্লেই ত হয়—

রাধু কিন্তু 'আপনিও' বলে না—দিদিও বলে না। বাবাজির সঙ্গে দেখা করিতেও আজকাল সময় হয় না। রাস্তা দিয়া যায়—একবার ফিরিয়া তাকায়।

...হয় ত কোনও দিন লীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে তার সঙ্গে চোখচোখি হইয়া যায়। লীলা বলে, বাবুর দেখা নেই কেন ?

বাবু বলে, অনেক কাজ কি না, তাই।—ভাল ত?

আমার আবার ভাল মন্দ। মাটির সঙ্গে মিশলেই হয়।

রাধানাথ একটু হাসিয়া চলিয়া যায়। লীলা চাহিয়া থাকে।

চটি জুতা জোড়াটি দেয়ালে ঠেকো দিয়া রাখিয়া বাবাজি বলিলেন, রাধুর সঙ্গে দেখা হল, বুঝলে?

লীলা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। বলিল, আসছে নাকি? ক'দিন আসে নি কেন?

বলে তার অনেক কাজ, সময় হয় না। একটি খবর দিতে পারি, বল সন্দেশ খাওয়াবে? তোমারই ভাই ত—

কি?

তার যে বিয়ে। এই ক'টা দিন বাদে। তাই দেশে যাবার যোগাড় কচ্ছে।

দেওয়ালের ধারে বসিয়া পড়িয়া ঢোঁক গিলিয়া লীলা বলিল, বিয়ে কার সঙ্গে?

তা কি জানি, তবে মেয়েটি নাকি সুন্দরী। বলিয়া বাবাজি ঘরে ঢুকিলেন।

শূন্য দৃষ্টিটা যেন গতিহীন—অর্থহীন! সর্ব্বস্ব হারাইলে লোকের চোখ দিয়া জল পড়ে কি?

শীতকালের বেলা ছোট, কাজ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। উপায় কি।

বাবাজির আজ ভাঙ সেবা হইয়াছে। সুতরাং সন্ধ্যা হইতেই

তিনি কুম্ভকর্ণ। কার জন্যই বা রান্নাবাড়া, খাবেই বা কে। নিজেই নিজের পরিচর্য্যা ভাল লাগে না। জীবন না দাসত্ব—যুগ যুগ ধরিয়া কেবল বন্ধনের অত্যাচার। সদর দরজায় দাঁড়াইয়া লীলা ভাবিতেছিল।

শীতরাতের চাঁদের আলো অবশ, নিঝুম। পৃথিবীর বুকের উপর জীবনের স্পন্দন থামিয়া গেছে।

...পিছন হইতে রাধানাথ বলিল, এখানে ব'সে যে?

লীলা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এমনি—

গুরুদেব কই?

ঘুমুচ্ছেন। জাগালে তাঁর শরীর খারাপ হবে। কেন?

দেশে যাচ্ছি, তাই একবার—

আচ্ছা কাল সকালে আমি বলব—লীলা বলিল।

এ মুখভঙ্গির সহিত রাধানাথের কোন দিনই পরিচয় ছিল না। তাই সে নিজের বক্তব্যও শেষ করিতে পারিল না। কিন্তু কথা কিছু কওয়া চাই। তাই সে বলিল, উঃ কি শীতই পড়েছে—বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় মাপ কর তুমি—কিছু মনে কর না—

লীলা বলিল, দোষ কল্লেই লোকে মাপ চায়—আপনি মাপ চাচ্ছেন কেন?

তাহার সজল কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধানাথ সরিয়া আসিয়া বলিল, কাঁদচ?—কেঁদো না দিদি—ছোট ভাই ব'লে মাপ কর।

লীলা সাড়া দিতে পারিল না—ভিতরে চলিয়া আসিল। আবার বাহিরে গিয়া দেখিল রাধানাথ চলিয়া গেছে। অনেক দূরে তার অস্পষ্ট ছায়াটা মিলাইয়া যাইতেছিল।

···বিপুল জ্যোৎস্না মাটির বুকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সে মৃত্যুর মত বিষাদময়ী—অচেতন। তুহিনের যবনিকা সেই মৃত পৃথিবীকে ঢাকিয়া দেয়। তাহার দিকে চাহিলে বুকের ভিতর কাঁপুনি ধরে। চক্ষু বুজিয়া আসে।

ছিন্নমুকুল

ভাড়াটে বাড়ী! মালিক একটি স্ত্রীলোক। বয়স অল্প, দেখিতে মন্দ নয় কিন্তু বিধবা। পাড়ার লোক বলে, উঃ কি অহঙ্কার—একে পয়সা, তায় রূপ। মাটিতে পা পড়ে না। হাজার হোক মেয়েমানুষ ত—

আমরাও মাঝে মাঝে তা টের পাই। নীচের তলায় থাকি। কলের জল লইয়া বচসা হয়। ছাদে কাপড় শুকানো লইয়া একদিন কলহও হইয়া গিয়াছে।

দিদি বলে, পুরোনো ভাড়াটে বলে তোমাদের জোর ত কিছুই নেই। উঠিয়েও দিতে পারি। নয় একদিন মনটা হু হু করবে—আরকি!

আমি বলি, বিশুর জন্যে কাঁদবে না দিদি?

বিশু আমার দাদার ছেলে।

দিদি চলিয়া যাইতে যাইতে বলে, করলেই বা। সামলাতে কতক্ষণ। নিজের সন্তানই যখন নেই তখন এত কিসের মায়া?

হাসিয়া বলি, সত্যি?

দিদিও হাসিয়া বলে, সত্যি নয় কি মিছে? তবে যদি মানুষ কর্ত্তে না পার ত বিশুকে না হয় দিয়েই যেও। তা মা বাপ হয়ে কি সে কাজ পারা যায়—বলিয়া দিদি বিশুকে কোলে লইয়া দুম দুম করিয়া চলিয়া যায়।

বড় বউ রাগিয়া বলে, ঠাকুর-পো ?

কি—

এসব আমার ভাল লাগে না। দিন নেই রাত নেই—ছেলে কাঁধে কল্লেই হল ? 'না বিইয়ে কানায়ের মা' আর কি ! 'বাঁজা'র কোলে ছেলে দেয়া পাঁজি পুঁথিতে নিষেধ আছে—তা জান ? ছেলের বয়েস চার বছর—তা তিন বছর ত ওর কোলেই মানুষ হল।

বলিলাম, বড় অন্যায়।

বৌ-দি রাগিয়া আগুন হইয়া বলে, তোমাদের কেবল তামাসা। মিষ্টি মুখে বল্লেন অন্যায় ! বলে, 'যার ধন তার নয়'—আমার যেমন পোড়া কপাল।

দিদি উপর হইতে শুনিতে পায়। দেখি খানিক বাদে আমারই সুমুখে বিশুকে বসাইরা দেয়। সে জানে, আমি কিছু বলিবই—তাই এ কাজ। আমিও বলিলাম, সখ মিটল দিদি ?

দিদি একটু হাসিয়া বলে, কি করব ভাই—'যার ধন তার ধন নয়'—

আমি স্পষ্ট দেখি, দিদির মুখে মোটেই সেটুকু হাসি নয়।

দিদি আর কিছু বলে না। লুকাইয়া চলিয়া যায়। আবার ঘুরিয়া আসে। বলে, আচ্ছা, বিশু যে আমার ছেলে নয় তার প্রমাণ ? কিন্তু পরক্ষণেই জিব কাটে, মুখ লাল করিয়া থামিয়া যায়। একটু পরে সরিয়া আসিয়া বলে, উনি গেছেন আজ পাঁচ বছর হল ভাই, আমার বয়েস তখন ঠিক উনিশ বছর। সেই বছরেই ত তোমরা এ বাড়ী এলে।

সেদিন কি একটা কথা লইয়া বৌ-দি'র সঙ্গে দিদির খুব খানিকটা কলহ হইয়া গেল। কিন্তু সেদিন বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, পরাজয়ের

ভারটা দিদি নিজের ঘাড়েই লইয়া চলিয়া গেল এবং সে যে কাঁদিয়াও ফেলিয়াছিল তাহাও পরে চুপি চুপি বৌ-দি আমায় বলিয়াছে !

সঙ্গে সঙ্গে বিশুর যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেল ।

উপরে যাওয়া-আসার একটি মাত্র দরজা—সেটি বৌ-দি সেদিন তালা আঁটিয়া দিল। কেবল সদর দরজা খোলা—সেখানে দিদিও আসিবেন না, বিশুও যাইবার পক্ষে নিতান্ত ছেলেমানুষ ।

বৌ-দি বলে, এই শাস্তি দিলে ঠিক জব্দ হবে ।

আমি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, গেলই বা বৌ-দি । কোলে নিলে ত আর বিশুর গায়ে ফোস্কা পড়চে না। ছেলেপুলে নেই বলেই ওঁর মায়া পড়েছে ।

বৌ-দি গম্ভীর ভাবে বলিল, এসব কথা তোমার কানে ওঠবার দরকার দেখি নে ঠাকুর-পো। বাড়ী ভাড়াই নিয়েছি, ছেলেকে ত ভাড়া নিই নি। তবে তোমার সঙ্গে যে দিদির খুব ভাব এটা খুবই বুঝতে পাচ্ছি, যার জন্যে ভাজও পর হয়ে যায়—বলিয়া একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া সে পুনরায় বলিল, ভাগ্যিস দিদিটি পেয়েছিলে, তাই ত তোমার দিন কাটছে ; এত আলাপ, তবু ভাল ।

চুপ করিয়া রহিলাম ।

বিশু কাঁদে, পিসীমা'র কাছে যাব—

বৌ-দি বলে, ও কথা বলতে নেই, মার খাবি ।

দু'একদিন বিশু দরজা ঠেলিয়া দেখিল, দরজা আর খোলে না। সদর দরজায় বাহির হইল না পাছে জুজু আসিয়া ধরে ।

দুপুর বেলা ঘরেই ছিলাম। ও-ধারে বৌ-দি বোধ হয় দিবা নিদ্রায় মগ্ন। বিশু ছুটাছুটি করিতে করিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাব না—জুজু আছে—মা বকবে—

আড়াল হইতে দেখিলাম, দিদি তাহাকে হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছে। আজ কয়দিন বাদে তাঁহাকে দেখিলাম। মনে হইল তাঁহার সে পরিষ্কার মুখখানির উপর কে কালি লেপিয়া দিয়াছে, চুলগুলি আলুথালু, চোখ দুইটি লাল, স্পষ্ট দেখিলাম, চোখের জল গালের উপর গড়াইয়া আসিয়াছে। বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। ওই অশ্রুর সহিত যেন মনে মনে আমারও আত্মীয়তা আছে।

বাহিরে আসিয়া বলিলাম, দিদির অসুখ বুঝি?

দিদি দ্রুতপদে সরিয়া গেল। একটু পরে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, দোষ করলে কি মাপ নেই ভাই?

বলিলাম, আমিও জানি—তুমিও জান দিদি—দোষ তোমার নেই, তবে মাপ চেয়ে কেন লজ্জা দাও?

দিদি এ কথা বোধ হয় শুনিল না, বিশুর দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমি পুনরায় বলিলাম, তোমায় চেহারা কি হয়ে গেছে দিদি, আজ রান্না নেই?

দিদি একটু হাসিল, তার পর বাঁ হাতের চেটোর উপর আঙল দিয়া লিখিয়া দেখাইল—একাদশী।

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম,—যা না বিশে, তোর পিসি-মা ডাকচে যে—?

বিশু আমায় ভয় করিত। বলিল, কোথা দিয়ে যাব?

বৌ-দি দ্রুতপদে বহির হইয়া বলিল, লোভ সকলকারই আছে, মুখ দিয়ে লাল পড়ে কেন ? চল্ বিশে, ঘুমুবি—বলিয়া সে বিশুকে টানিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া গেলাম। দেখি, দিদি তার আগেই চলিয়া গিয়াছে।

বর্ষাটা সেদিন বড় জোরেই চাপিয়া আসিয়াছিল। মনে হইল, এ প্লাবনের বুঝি আর বিরাম নাই। সংসারের সমস্ত দুঃখের মলিনতা কি এর স্রোতে ধুইয়া যায় না ?

শহরতলীর এক পাশ। সুমুখের পড়ো মাঠের ধার দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। হাঁটু অবধি কাদা। লোকালয় কম—মাঝে মাঝে এক আধটা বস্তি। এ মাঠে নাকি আগে কোন্ বড় লোকের বাড়ী ছিল। তার চিহ্নস্বরূপ দু'একটা পাঁচিলের ভগ্নাংশ আজও কাৎ হইয়া আছে, তাহারই ধারে একটা জীর্ণ অশ্বত্থ গাছের শাখায় বাদলার বাতাস ব্যথার ভার লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

আপন মনে বাড়ী ঢুকিতেছিলাম। উপর দিকে নজর পড়িতেই দেখি ছোট জানালাটির ধারে দিদি বসিয়া আছে। হঠাৎ কি জানি পা চলিল না—ছাতাটি তুলিয়া উপর দিকে চাহিলাম। দিদি দেখিতে পায় নাই। লক্ষ্য করিলাম, কাঁদিতেছে। সহসা একটি বস্তু আজ কি জানি কেন হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আজ সংসারে ইহার কি কেহ নাই ? জনহীন শূন্য পুরীর পাথরখানা এই যে ইহার তরুণ ব্যর্থ বুকটার উপর কতদিন হইতে চাপিয়া আছে, ইহার কি প্রতীকার নাই ? রূপ ও ঐশ্বর্য্যের আবরণের তলায় শরাহতা কপোতীর মত ভূলুণ্ঠিত হইয়া এই

যে নারীটা ছটফট করিতেছে, এর কারণ কি ?—অথচ আমার এ অসংবদ্ধ অনভিজ্ঞ প্রশ্নের উত্তর আমি সেদিন কোনও মতেই পাই নাই।

চলিয়া আসিতেছিলাম। দিদি বলিল, হাসিয়াই বলিল, মাথা খারাপ হয়েছে বুঝি ! জলে ভিজ্‌ছ কেন ? ভেতরে এসো।

লজ্জিত হইয়া কি করিব ভাবিতেছি। দিদি আবার অনুযোগ করিয়া বলিল, দিদির ঘরে পায়ের ধূলো পড়তে নেই বুঝি ? খুব বিদ্বে হয়েছে যা হ'ক—

আজ আমার হাসিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, তোমারও ত খুব বিদ্বে, ছোট ভায়ের পায়ের ধূলো চাও ?

ভিতরে আসিয়া দিদির উপরের দালানে বসিলাম। ভয় করিতেছিল পাছে বৌ-দি জানিতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে কিছুই শুনিবার উপায় ছিল না।

বলিলাম, জানলার ধারে বসেছিলে যে ?

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিদি বলিল, যে বাদল, কিছু ভাল লাগে না।

চুপ করিয়া রহিলাম। এতদিন বাদে আজও সেই বর্ষার স্বল্প অন্ধকারে দিদির করুণ সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে। ভাবি সেদিনকার সে মুখে কোন্ ভাবের ছায়াপাত দেখিয়াছিলাম। তখন বাহিরের দৃষ্টিই খোলা ছিল, ভিতরে তলাইবার বয়স হয় নাই। কিন্তু আজ জ্ঞান হইয়াও ত সে মুখখানির নিকট আমি তেমনি অজ্ঞান। তা সে যাই হোক, দিদি একটু থামিয়া বলিল, তোমার বৌ-দি ত আজ আমায় যাচ্ছেতাই করলেন—

মনে মনে লজ্জিত হইয়া বলিলাম, ও কথা আর না-ই তুললে দিদি।

—তোমার শোনা দরকার ভাই, শোন। বলিয়া দিদি যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই, বিশু তাঁহার কাছে আসিবার জন্য কান্না জুড়িয়াছিল কিন্তু তাহার মা আসিতে দেয় নাই। অবশেষে বিশু জুজুর ভয়কে তুচ্ছ করিয়া সদর দরজায় আসিতেই তিনি কোলে করিয়া উপরে আনিয়াছিলেন। কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য, বিশু তাঁহার তরকারীর বঁটিতে হাতের আঙ্গুল কাটিয়া রক্তারক্তি করিয়াছে। শেষে দিদি সজল চোখে বলিল, আর শুনে কাজ নেই ভাই—বিধবাদের কানে সে কথা গেলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়—

মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে সুদূরের মাঠে বৃষ্টির অবিরাম ঝর ঝর শব্দ শুনা যাইতেছিল। সেও যেন বিধাতার মর্ম্ম-ভাঙ্গা অশ্রুজল।

দিদিকে সত্যই আমি ভাল বাসিয়াছিলাম এবং সেদিন হঠাৎ তাহার গলা জড়াইয়া হাত ধরিয়া যাহা বলিয়া ছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে করিতে পারি। পাগলের মত বলিলাম, দিদি কেঁদো না। তুমি মারো ধর' আমি সহ্য করব কিন্তু তুমি কেঁদো না—ও আমি দেখতে পারি না।—দিদির নিপীড়িত হৃদয় বুঝি আমার কাছে এইটুকুই প্রত্যাশা করিয়াছিল। বলিল, আমরা কেন এক মায়ের সন্তান হই নি, ভাই ?

আমি আবেগের সহিত বলিলাম, সেইটিই ধরে নাও না দিদি ?

আমারও চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

দিদি চোখ মুছিয়া বলিল, ভাই, তোকে পেয়ে আমার একদিক যেমন ভরে উঠল, তেমনি আর এক দিক যে ভয়ানক ফাঁকা—সে ফাঁকার দিকে চাইতেও যেন ভয় করে ভাই !

চুপ করিয়া রহিলাম। দিদি আবার বলিল, গান জানিস রে ?

এমন অসময়ে গান নইলে কিছু ভাল লাগে না,—না থাক্।—বলিয়া দিদি উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই নানারকমের খাবার আনিয়া হাসিমুখে বলিল, একটুখানি ভুল কচ্ছিলাম, গানের চেয়ে আমার এই ভাই-ফোঁটাই ভাল।

কিন্তু পূর্ব্বদিনের ঘটনার জের টানিয়া বৌ-দি আবার যখন পরদিক কলহের সূত্রপাত করিল, তখন আর দিদি সহ্য করিল না। সেও ত মানুষ। বলিল, বড়বউ ভাই, কাল তোমার পায়ে ধরে মাপ চেয়েছি কিন্তু তাতেও যখন শুনলে না তখন আমি নিজেকে আর বেশী সস্তা করব না। আজ থেকে তিন দিনের সময় দিচ্ছি তোমরা বাড়ী থেকে উঠে যাও। সত্যি, টাকা দিয়ে তোমরা আমার অসদ্ব্যবহারই বা সহ্য করবে কেন?

বৌ-দি বলিল, সে কথা না বললেও চল্‌ত। তত কাঁচা মেয়ে আমি নই। কালই আমি দাদাকে দিয়ে বাড়ী ঠিক করিয়েছি।

আড়াল হইতে দেখিলাম, দিদির মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু আমার এ কি হইল! আমি সারাদিন কোথাও শান্তি পাইলাম না। একদিন চলিয়া যাইব জানিতাম কিন্তু সে কবে তাহার কোনও স্থিরতাই যে ছিল না। আজ যাওয়ার কথাটা এমন নির্দ্দয় সত্য হইয়া দেখা দিবে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। দিদিই বা কি! সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি ছল্ করিয়া তাহার দোরে আনাগোনা করিলাম, কতবার তাহার জানালার দিকে উঁকি মারিলাম, নানারূপ শব্দ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে এমনি নিষ্ঠুর

যে, একবার দেখাটা পর্য্যন্ত দিল না। অথচ আমি কেমন করিয়া যেন জানিতেছিলাম, দিদি দেখিয়াও দেখিল না। সেদিনকার সে অভিমানটি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।

সকাল বেলা দাদা বলিল, তৈরী হয়ে নে—যেতে হবে আজ।

বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, বলিলাম, আর দুদিন থাকলে হয় না?

—গাধা কোথাকার! দুদিন বাদেও ত যেতে হবে। বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দাদা বলিলেন, মেয়েমানুষ কর্ত্তা সাজলে এমনি টানা হেঁচড়াই কর্ত্তে হয়।

নূতন বাড়ীতে জিনিসপত্র চালান হইয়া গেল। দাদা আগেই চলিয়া গিয়াছেন।

বৌ-দি'র দাদা গাড়ী লইয়া হাজির। ছেলেকে লইয়া বৌ-দি গাড়ীতে উঠিল।

আমিও যাইতেছিলাম, শব্দ আসিল, শোন্।

ফিরিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সে দিদি আর নাই, চেনা দায়। একদিনেই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আমায় ভাবিবার সময় না দিয়া দিদি কাঙালিনীর মত বলিয়া উঠিল, একবার বিশেকে দে-না ভাই, একবার—

অনেক অনুনয় করিয়া বৌ-দি'র নিকট হইতে বিশেকে আনিয়া দিলাম। বৌদি বলিল, যদি এত ভালবাসাবাসি, বিশের নামে বাড়ী-খানা লিখে দিক্ না—

এ নির্লজ্জ উক্তির পর আমার আর কথা বাহির হইল না।

কিন্তু তারপরের সে দৃশ্য আমি আর ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না।

বিশেকে কোলে পাইয়াও দিদির চোখে অশ্রু নাই—যেন স্তব্ধ হইয়া গেছে। কিন্তু বিশু! ওই অতটুকু বালক—ও এত চোখের জল পাইল কোথায়? কে এমন করিয়া উহাকে সঙ্গোপনে অশ্রুর বাঁধ বাঁধিতে শিখাইয়াছিল?

দিদি বলিল, আমি যেতে দেবো না—গাড়ী ফিরিয়ে দাও। না, কিছুতেই আমি যেতে দেবো না!

আমি চেষ্টা করিয়া হাসিলাম। দিদি পুনরায় বলিল, হয় না? খুব হয়—ইচ্ছে থাকলেই হয়। বলিয়া গাড়ীর কাছে গিয়া বলিল, বড়-বউ, ভাই, রাগ ক'র না—ফিরে এস!

বড়বউ বলিল, কেন দেরি করিয়ে দিচ্ছ ভাই? যাবার সময় আর কষ্ট দিও না।

দিদি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, ভাই, না হয় আজ থেকে লিখে পড়ে দিচ্ছি—তোমাদের কাছে আর ভাড়া নেবো না।

এইবার বড়বউ রাগিয়া বলিল, আমরা ত কাঙালী নই যে, অমনি থাকব? কিন্তু আর তোমার আদিখ্যেতা ভাল লাগচে না ভাই,—ঢের হয়েছে—ছেলেটাকে এখন ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দাও।—

বলিয়া হাত বাড়াইয়া বিশুকে টানিয়া লইল।

তারপর অনেকগুলি দিন দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন দিদির বাড়ী গেলাম। আমায় দেখিয়া বলিল, চিঠি পেয়েছিলে?

ঘাড় নাড়িলাম।

দিদি পুনরায় বলিল, তোমায় দরকার আছে—আমার শেষের কাজটি করে দাও ভাই। নৈলে কে আর আছে?

—কি বল না দিদি ?

দিদি বলিল, বৈদ্যনাথে যাব। আমার জ্যেঠি-মা সেখানে আছেন, তিনি মায়েরও বাড়া। অনেক করে আসতে লিখেছিলেন, যাওয়া ঘটে নি, এইবার গিয়ে বাস করব। রেখে আসতে পারবে ?—বলিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিল।

হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, খু—ব পারব, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কথাতে ভয় পাইয়া বলিলাম, দেশ ছেড়ে যাবে দিদি ? দেখা হবে না যে।

দিদির চোখের জল গোপন করিয়া বলিল, দেখা না পেলেও যে বাঁচতে হয় ভাই।

'মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?'

ধূলার দেশ।—কেঁচোর মাটি আর ব্যাঙের ছাতা শুধু কথার কথা।

পশ্চিমের বড় শহর। কাছেই নদী—গঙ্গা ; গতযৌবনা।

বাঙালী পাড়াটি ছোট,—কোণঠেসা। মাঝখানে মানস-সরোবর।

ওর প্রথম 'স'টি নেই—জলমগ্ন। এখন শুধু মান্-সরোবর। পানা-পচা খানিকটা জল আর স্থবির দু' একটা কচ্ছপ—এই মূলধন।

বিশুদার আস্তানা পাশেই। একটা গলির বাঁকে। গঙ্গা হইতে মিনিট পাঁচেকের পথ।

বিশুদার কাজ শুধু পাথর-খোদাই,—দিনরাত। লোকটি বড় শান্ত। সংসারের বালাই নেই। বছর আষ্টেকের একটি রুগ্ণ ছেলে—এইটুকু যা উদ্বেগ। বউটি পটল তুলিয়াছে মাস কয়েক আগে। ও তখন আরঙ্গাবাদে।

ইতর ভদ্র সকলেরই বিশুদা। শিল্পাগারের মেয়েরাও ওই বলিয়া ডাকে—আবার বাজারের ব্যাপারিদের কাছেও ওই নামে পরিচয়।

জল খাওয়ার নামে তাহারই বাড়ীতে ইস্কুলের মেয়েদের আড্ডা। বিশুদার দিদি ওরা সকলেই।

সার্কাস দেখিবার পথে সেদিন বিশুদার ঘরে তাড়াতাড়ি আসিয়া রেবা কহিল, দেখ ত বিশুদা, আমি কিন্তু এবার সত্যিই রাগ করবো তা বলে দিচ্ছি।

অভিমানের সুর!—বিশুদা কহিল, কি হল দিদি?

তোমার কাছে পাথর-খোদাই শিখ্‌বো শুনে সবিতা-দি ঝগড়া কর্ত্তে এল।

এতে তার কি?

সে-ই জানে! অথচ তোমার সঙ্গে ত ওর একটুও বনে না। এসে ত কেবল তোমার জিনিসপত্তর ভেঙে চুরে ভণ্ডুল করে' দিয়ে যায়। দাদা বলে' একবার ডাকতেও শুনলুম না কোনদিন। একগুঁয়ে মেয়ে কোথাকার! বলে—আমরা কেউ তোমার কাছে আসতে পাব না। বিধবা বলে' ওর সব আব্‌দার বুঝি আমাদের রক্ষে কর্ত্তে হবে?

না না—তা নয়। কি জানো রেবা—?

জান্‌তে চাইনে বিশুদা। তুমি কারো একার নও।

বিশুদা এবার হাসিল—আমি সকলের বুঝি?

নিশ্চয়। কারো 'পেটেণ্ট্‌' করাও নয়। আমার কথা শুনে—বুঝলে বিশুদা?—সবিতা-দি ত গর গর কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল। অম্বা ত ওকে যাচ্ছেতাই বলে' দিয়েছে।

বিশুদার হাতের কাজ পড়িয়া থাকে। মুখ তুলিয়া বলে, অম্বা কিন্তু ভারি দুষ্টু ভাই। সবিতাকে ও যা-তা বলে।

বলবে না ? নিশ্চয় বলবে। সেদিন পাথর-কাটা যন্তরটা ছুঁড়ে সবিতা-দি তোমার হাতে রক্ত বার করে' দিলে, তুমি ত কিচ্ছুটি বল্লে না।

বিশুদা হাত ঘুরাইয়া দেখিল। কহিল, দাগটা আছে বটে এখনও। —কিন্তু কিছু বলা কি উচিত ভাই ? বিশেষত সবিতা—

বিধবা,—কেমন ? তা আমরাও কুমারী সুতরাং বিশেষ তফাৎ নেই বিশুদা।—রেবা যেমন আসিয়াছিল, তেম্‌নি চলিয়া গেল।

ও যেমন আপনার মনে নদীর মত গান গান গাহিয়া চলে—বাধা পাইলে তেম্‌নি উত্তাল হইয়া ওঠে!

সবিতার কথা ওইখানেই শেষ হয়। বিশুদার খেয়াল থাকে না।

ঘরে রুগ্‌ণ ছেলে। কিন্তু কাজের কামাই নাই। নূতন মন্দির কোথাও হয়—অমনি বিশুদার ডাক পড়ে। চমৎকার হাত,—মাথাও। পাথর হইতে মূর্ত্তি কুঁদিয়া বাহির করে। নূতন গড়ন, নূতন ধরন, নূতন ভঙ্গি। কোনটা পুরুষ, কোনটা নারী,—কোনটা বা জানোয়ারের।

কিন্তু নারী মূর্ত্তি !—ওইটি হয় আরও চমৎকার !

কারণ আছে। বৌ ছিল বিদ্যুৎলতা। নাম—করবী। কিন্তু তার চোখ দুটি ?—নীলপদ্ম ! পাষাণে ফুটিয়া এখনও কথা বলে।

বিশুদার এখন শুধু ম্লান হাসি,—বাঁচ্‌বে না কেউই। কি রাণী কি কানি।

অম্বা রাগ করে,—কিন্তু তোমর এ তত্ত্ব-কথা সংসারে খাটে না, বিশুদা।

কেন দিদি? ভাঙা হাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে লাভ কি?

ওদিকে রেবা তখন ছোঁক্ ছোঁক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথায় কি হুট্‌পাট্ শব্দ করে। গান গায়। হয় বা কবিতা আওড়ায়। কিম্বা অন্তত ভাঙা-তক্তায় হাত চাপ্‌ড়াইয়া তব্‌লাও বাজায়।

রেবার জ্বালায় কোথাও শান্তি নেই বিশুদা।

বেশ। ভূতের মুখে রাম নাম।—একটু নীরব থাকিয়া বিশুদা আবার কহিল, শান্তিটাকে আমি বড় ভয় করি, দিদি। চারিদিক নিশুতি হলে যেন বুক চেপে ধরে। সরগরমে থাকাই জীবন—নৈলে ত মরেই আছি।

একমনে মূর্ত্তির উপর আবার তাহার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য চলিতে থাকে।

ঢট্ করিয়া অম্বা উঠিয়া গেল। কিন্তু রেবার কাছে নয়—অন্য ঘরে। একটু পরে ওদিক হইতে রেবা বাহির হইল,—কোথা গেলি অম্বা? চলে' গেল বুঝি?

ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া দেখে, অম্বার কোলে রুগ্‌ণ ছেলে। জানালার দিকে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া।—যেন সমাহিত ভাব!

সমস্ত পাড়াটার মধ্যে অতবড় চঞ্চল মেয়ে নাই। মার ধোর, দুষ্টামি, ইস্কুল পালানো—কোন বিষয়েই পুরুষের চেয়ে খাটো নয়। মাছ ধরিতে, সাঁতার কাটিতে যে-কোনও যুবকের সমকক্ষ। হকি খেলায় ইস্কুলের সব মেয়েদের মধ্যে সে প্রথম। দুষ্ট গরুর শিঙ্ ধরিয়া সে নাচিবার চেষ্টা করে।

আজ সে শান্ত। যেন বালকটির সীমায় আসিয়া তাহার সমস্ত চাঞ্চল্যের স্পন্দন একেবারে স্থির !

রেবা হাসিয়া ফেলিল,—ছেলে তোর কানে মন্তর দিলে নাকি ?

ঘুমন্ত ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি অম্বা বিছানার শোয়াইয়া দিল।

যেন ধরা পড়িয়া গেছে—

বলিল, কাঁদছিল কিনা তাই একটুখানি—কিন্তু ছেলেটি বিশুদার ভারি শান্ত, না রে ?

হুঁ—খুব।

চল্ বাড়ী যাই।

রেবার ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়িল—তাই চল্। তা ছাড়া যে আছাড়টি আজ হয়েছে তোমার—রাতের বেলায় বিছানায় শুয়ে নিজের গা নিজে টিপো।

অম্বার খিল্ খিল্ করিয়া হাসি,—তা ছাড়া আবার কে টিপবে ?

দূর মুখপুড়ি আমি কি তাই বল্‌ছি ?

রেবা চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে অম্বা। সে আর একবার মুখ ফিরাইল—ছেলেটি তখন কাৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া আছে।

নির্জ্জীব, দুর্ব্বল !—অক্ষম শিল্পীর রচনা !

খানিক পরে রেবার পুনঃপ্রবেশ। আসিতে আসিতেই চীৎকার করিয়া অভিনয়।

আপনার খেয়ালেই—

হঠাৎ আসিয়া বিশুদার হাত হইতে বাটালি, উকো কাড়িয়া লইল, —আমি মরব চেঁচিয়ে আর তুমি কাজ করে' যাবে ? কক্ষণো না।

মহা বিপদ ! বিশুদা হাত গুটাইল—কি করব তবে ?

গান কর্ত্তে পার না ?

কি গান ভাই ?

এমনি যা তা। পুতুল গড় আর গান জান না ? ভাল একটি মূর্ত্তি ত গানেরই মতন।

কিন্তু লোকে কি বলবে ?

বা—। বলবে আবার কি ? গান ত চারিদিকেই ছড়ানো। নদী পাখী ফুল মাটি আকাশ—সবাই ত গান করে ! মানুষ ত গানেতেই পাগল !

আমার গান গাওয়া যে সত্যই পাগলামি ভাই। গান গাইতে সকলেই পারে। পারে না পাথর, পারে না মরু। ছেলেটা কাঁদচে বুঝি—

বিশুদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে গেল।

ছেলের তখন অকাতরে ঘুম। বিশুদা জানলা বন্ধ করিয়া দিল।—ঠাণ্ডা লাগিবে। বালিশটা গোছ করিয়া দিল। ছেলের গায়ে একটি কাপড় ঢাকা দিল। একবার একটুখানি আদর—। তারপর আবার বাহির হইয়া আসিল।

শিষ্ দিতে দিতে রেবার তখন যাইবার পালা।

যেন উচ্ছল ঝরণা—।

মরুপথে পথ-ভোলা জল-বালিকা যেন !

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল—আরে, সবিতা-দি বসে' এখানে চুপটি করে' ?

আছি এম্‌নি।—মুখ তুলিল সবিতা।

তাহার কাছে বসিয়া রেবা কহিল, সবিতা-দি—মাপ করবে ভাই ? তোমাকে যেন কি সব বলেছিলুম।

কি ?

তা মনে নেই। কিন্তু মনের ভেতরেই দোষ করেছি।

মাপ চাও তবে নিজেরই কাছে।

দু'জনেই হাসিল। আর মেঘ নাই—পরিষ্কার।

বাড়ী যাই, ক্ষিধে পেয়ে গেছে।—রেবা উঠিয়া আবার শিষ্ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

ইঁদারার পাশটিতে সবিতা বসিয়া রহিল। পাশেই একটা বেলগাছ। তারই মাঝে সবিতা যেন গোপন রজনীগন্ধা!

বিশুদা মুখ বাড়াইল—চুপটি করে' বসেছিলে কেন এতক্ষণ ?

সবিতার প্রখর দৃষ্টি। কহিল, তাতে তোমার কি ?

বিশুদা তাহাকে সমীহ করিয়া চলে। তবুও হাসিয়া কহিল, কিন্তু বাড়ীটা যে আমার।

কঠিন মুখে সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল ; নিঃশব্দে।

আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নয়—দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সটান্ বাহির হইয়া গেল—একেবারে রাস্তায়।

বিশুদা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আমি তা বলি নি, শোন সবিতা,—এ শুধু হাসির কথা—।

সেও বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু সবিতা তখন নাগালেরও বাহিরে।

মুন্না বলে, এ আমি মান্‌তে পারি না।

রেবা বলে, না মান বয়ে' গেল। বিশুদার কাছে আমরা যাবই। ওর কাছে জল না খেলে আমাদের তেষ্টা যায় না।

ইংরেজিতে মুন্না বলে, ভণ্ডামি—দুর্নীতি! যে মেয়েরা নিজেদের 'সংরক্ষিত' না রাখে আমি তাদের—

অম্বা তাহার দিকে নিঃশব্দে তাকায়। ইচ্ছা করে ওর গালে দুইটা চড় বসাইয়া দেয়।

মুন্না উকীলের মেয়ে। অঙ্ক জানে ভালো। বলে—

কি ছাই মূর্ত্তি গড়ে ও লোকটা? না মাথা—না মুণ্ডু। ভাল ভাল 'ক্রিটিকে'র পাল্লায় পড়লে নাস্তানাবুদ হতে হত। যেমন ছাঁদ তেমনি ছিরি।—আমার মুখ একটু আল্‌গা—কি-না-কি বলে ফেল্‌বো, তাই ত যাই না ওই মিস্তিরিটার ঘরে।

রেবা বলে, তোমার মতন শুক্‌নো রুক্ষু মেয়ে হলে ত ভাই সকলের চলে না, তাদের যেতেই হয়।

যে যায় যাক্ না—আমার কি! তবে যতক্ষণ ঠাট্টা তামাসা করব ততক্ষণ একটা আঁক কষ্‌লে বরং—বাবার এক মক্কেল বলেন—

গোল্লায় যাক্ তোমার মক্কেল!—অম্বা আর রেবা উঠিয়া চলিয়া গেল।

বাবার মক্কেলের প্রতি এমন কটূক্তি!

তীব্র দৃষ্টিতে মুন্না সেদিকে চাহিল। কহিল, পুরুষ মানুষকে আমি ঘৃণা করি।

ঝাল্‌টা বিশুদার উপরেই—

পায়ে পায়ে সন্তর্পণে বিশুদার ঘরের কাছে সবিতা।—ছেলের জন্য বিশুদা দুধ গরম করিতেছিল।

মুখ ফিরাইয়া কহিল—সবিতা যে, এসো এসো। মনে হচ্ছিল সেদিন রাগ করে' চলে গেলে। সত্যি ?

রাগই ত! দাঁত দিয়া সবিতা অধর চাপিল।

বিশুদা হাসিল—তা হক্। সকলে যেন আমার উপর রাগই করে। একটুখানি তামাসাও করিল—রাগের বাঁ-দিকে 'অনু'টা যেন করো না নাকো।

উঠিয়া গিয়া বিশুদা একখানি আসন আনিল।

বসো সবিতা, সত্যি কথা বলতে কি—তোমাকে একটু ভয় করি ভাই।

আসন পাতিয়া দিল।

একটা পা দিয়া সবিতা আসনটাকে অন্যদিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, দরকার নেই খাতিরে।

বিশুদা মুখ তুলিয়া চাহিল।—ভয়ে কাঠ!

সবিতার ভ্রূক্ষেপ নাই। কহিল, কাজ কর্ম্ম তোমার চলে কি করে' ?

বিশুদা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা এম্‌নি—এমন আর কি কাজ। শুধু ছেলেটা—তা যা হক করে'—

ছেলের একটা ঝি দরকার হয় না ?

ন্-নাঃ।

এদিক ওদিক তাকাইয়া সবিতা বলিল, আমার নামে রেবা যে এসে তোমার কাছে বলে, তা শুনেছি। গায়ে গায়ে বাড়ী, চোখ কান সবই থাকে এদিকে।

ও—। বিশুদা আড়ষ্ট। বলিল, কিন্তু রেবা ত এমন বিশেষ কিছুই—

তা জানি। হঠাৎ হাসিয়া সবিতা কহিল, কিন্তু আমার হয়ে তুমি

ওদের কাছে ওকালতি কর কেন ? আমার নিন্দে বুঝি তোমার গায়ে লাগে ?

সবিতা হাসে কিন্তু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকে তার দুটি চোখ। সন্ধ্যার অন্ধকারেও বিশুদা দেখিতে পায়।

হঠাৎ ছেলেটা কাঁদিয়া বাঁচাইল।

যাই রে যাই।—বিশুদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইল।

পিছন হইতে সবিতার শুষ্ক কঠিন কণ্ঠ,—ছেলের এতটুকু কান্নাও বুঝি সহ্য হয় না ?

উত্তর পাইল না।

একটু পরে বিশুদা বাহির হইয়া আসিল ! ছেলে শান্ত হইয়াছে।

দেখে—মেঝের উপর দুধের বাটি উল্টানো, জলের ঘটিটা গড়াগড়ি, খাবার ছিল ঢাকা—এখানে ওখানে ছড়ানো ; জলে-দুধে-খাবারে একাকার চারিদিক !

অভিভূতের মত সে কহিল, কে কল্লে ?

এক-পা এক-পা করিয়া সবিতা বাহিরে যাইতেছিল, বলিল—আমি।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

সবিতা চলিয়া গেছে—

বিশুদা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিল। সুমুখের অন্ধকার বেলগাছটা। কহিল, উপোস করবে আজ রুগ্‌ণ ছেলেটা ? আর ত কিছু নেই।

সংসারে ওই তৃণটিই সম্বল তাহার।

অম্বা আর ইস্কুলে যায় না। দেখা মেলা ভার। হঠাৎ সে দলছাড়া।

দুপুর বেলা সেদিন সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিল। পশ্চিমের এদেশে মেয়েদের বাঁধাবাঁধি বিশেষ নাই।

রূপলোভী পুরুষেরই কি অভাব ? ওরা স্বর্গে গিয়াও উর্ব্বশীকে দেখে।

দূর ছাই—। অম্বা আবার ফিরিয়া চলিল।

গলিঘুঁজি পার হইয়া বরাবর গঙ্গার ঘাটে।

শীতকাল—তবু রৌদ্রটা খুব তীক্ষ্ণ। ঘাটে আসিয়া অম্বা একবার দাঁড়াইল।

গঙ্গার এপার ওপার অনেকখানি চওড়া। কিন্তু সবটা জল নয়—ওপারের প্রায় অর্দ্ধেকটা বালির চড়া। সূর্য্যের আলোয় দূর হইতেও চক্ চক্ করিতেছে। দূরে ছোট ছোট দু-একখানি নৌকা।

ওপারে রাজার প্রাসাদ—রামনগর।

ঘাটে লোকজন কেহ নাই। শুধু একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল।

অম্বা ঘাটে নামিল। জামাকাপড় সুদ্ধ একেবারে গলা জলে। অন্যদিন সিঁড়ি হইতে ঝাঁপাইয়া জলে পড়িত ; আজ নিয়ম-ভঙ্গ !

সাঁতার কাটিতেও অরুচি। ধীরে সুস্থে স্নান সারিয়া সে উঠিয়া আসিল।

কাপড়ের একধারে মাথা মুছিল। জল ঝরাইল। তারপর রাস্তায় উঠিয়া আসিল।

মেয়ে যেন কত শান্ত !

বাঁ-হাতি কালি মন্দির। ভিতরে ঢুকিল। আঁচল হইতে পয়সা খুলিয়া পুরোহিতের কাছে রাখিয়া বলিল, ফুল নৈবিদ্যির জন্যে দিলুম। একটু পেসাদ দাও ত ঠাকুর !

প্রসাদ হাতে লইয়া অম্বা এদিক ওদিক চাহিল—কেহ কোথাও নাই। চট্ করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

এবারেও বাড়ীর পথে নয়—অন্যদিকে।

অপরাহ্ণ বেলায় সটান্ বিশুদার ঘরে।

কাহারও সাড়া নাই। তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতর ঢুকিল।

রুগ্‌ণ ছেলেটী যেন কেমন-কেমন! মুখখানা রক্তহীন, চোখ দুটা ঝাপ্‌সা, গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ—যেন কি রকম! চিঁ চিঁ করিয়া অস্পষ্ট কথা বলে, হাত পা বিশেষ নাড়ে না—ভিতরে কোথায় যেন তলাইয়া থাকে।

অম্বা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। কাপড় চোপড় তখনও ভিজা। আবার তাহাকে বিছানায় শোয়াইল। পরে প্রসাদী ফুলগুলি তাহার মাথায় ঠেকাইয়া বিছানার উপরেই ছড়াইয়া দিল।

বাঁ-হাতে ছিল ডাক্তারী ঔষধ। শিশির ছিপি খুলিয়া সে একদাগ খাওয়াইল। বিছানা ভাল করিয়াই প্রস্তুত। সে আর একবার ঝাড়িয়া মুছিয়া দিল।

এম্‌নি করিয়া যত্নের আর অন্ত নাই।

এ যত্ন যেন মায়েরও নয়—ভগ্নীরও নয়; এ যেন অন্যরূপ।

ছেলেটা চোখ চাহিয়াছিল, অম্বা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কে আমি বল্‌তে পারো?

তুমি? কেউ না!

সময় কাটিতে থাকে!

ঘরে ঢুকিল বিশুদা। দেখে—ছেলের কাছে বসিয়া অম্বা। বিছানায় ফুলের গন্ধ চারিদিকে।

অম্বা-দিদির খবর কি গো ? ফুলশয্যে নাকি ?

ধড়মড় করিয়া অম্বা উঠিয়া পড়িল। বিশুদার আসা টের পায় নাই।

বলিল, ছেলেকে একলা রেখে তোমার এমন রোজগার নাই-বা হ'ল বিশুদা ?

একলা ? এমন দরদী আছে জান্‌লে বাড়ীই আসতুম না আজকে।

কি যে বল তুমি।—লজ্জায় অম্বার মাথা হেঁট।

বিশুদার মৃদু হাসি,—ছেলে আছে কেমন ?

ভালই—সেরে যাবে।—অম্বা বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়।

ছাদের পাঁচিলের কাছে দাঁড়াইয়া সবিতা সবই দেখে।—বিশুদার সংসার চলে।

ছেলের জন্য বিশুদার চোখে জল আসে। সবিতা তাহাও অনুভব করিতে পারে।

ঠুক্‌ঠুক্‌ করিয়া সেদিন বিশুদা কাজ করিতেছিল আপন মনেই,—সবিতা ভিতরে আসিল।

ইঁদারার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—। অনেক নীচুতে জলের ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিল।—দেখিয়া হাসি। বিশুদার চোখ-চোখি হইলে রাগ হয়।

হয় ত অকারণে বাল্‌তিটার শব্দ করিতে থাকে। ঘটিবাটিগুলা পা

দিয়া এধার ওধার ছুঁড়িয়া দেয়। ইঁদারার বাঁধুনির উপর হাত চাপ্‌ড়াইয়া আওয়াজ করে। বিশুদার মনোযোগ নষ্ট হইলে সে খুশী হয়!

দেখিয়া দেখিয়া বিশুদা হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু কথা বলিতে সাহস নাই।

কিন্তু তাহার কাজও আর হয় না—ছেলের তদ্বির করিতে উঠিয়া যায়।

সবিতা গিয়া ঘরে উঁকি মারিল। দেখে—ব্যাকুলভাবে বিশুদা ছেলেকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

সন্তানের বন্ধন আরও দৃঢ় হউক!

সবিতার কঠিন হাসি। সরিয়া আসিল। সুমুখে অসমাপ্ত মূর্ত্তিটা। হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের নখে'করিয়া সেটা আঁচড়াইতে লাগিল।

পাথরে আঁচড় চলে না!

কাছেই খোদাই করিবার যন্ত্রগুলি।—তাহাই আঁচলের মধ্যে কুড়াইয়া লইয়া ওধারে চলিয়া গেল।

এক জায়গায় আসিয়া বসিল।—দাঁত দিয়া অধর চাপা।

বিশুদা যখন বাহিরে আসিল, দেখে—যন্ত্রপাতি উধাও। বুঝিতে পারিল; হাসিয়া বলিল, বা রে বা! গেল কোথায় এগুলো? একেবারে ভৌতিক!

সবিতার দিকে চাহিল—উত্তর নাই। বিধবা মেয়েটা এবার শুধু মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

থাক্ তবে,—এখন আর কাজকর্ম্ম কিছু হবে না। মুখ হাত ধুয়ে এখুনি ছেলের ওষুধ আন্‌তে যাবো।—চঞ্চল হইয়া বিশুদা আর এক-দিকে পা বাড়াইল।

সবিতার তৎক্ষণাৎ রাগ। যন্ত্রপাতিগুলি আঁচল হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিল,—আমি ত আর নিই নি।

বিশুদার কানে গেল না কথাগুলি। যখন মুখ হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিল—সবিতা তখন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া।

বেরিয়ে যাচ্ছো, ছেলে দেখবে কে ?

ছেলে ঘুমিয়েছে। বিশুদা বলিল।

যখন জাগ্‌বে ?

ততক্ষণে আমি এসে পড়বো।

সবিতা নিরুপায়। হঠাৎ বিশুদার বাহির হইবার জামাটি টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

শোন' সবিতা শোন'—আমায় বেরোতে হবে এখুনি,—বিশুদা আগাইয়া আসিল।

সবিতা শুনিল না। দূরে সরিয়া গেল ;—আড়ালে। কোলে জামাটি লুকানো। মুখে হাসি।

বিশুদা অগত্যা যন্ত্রপাতির দিকে চাহিয়া বলিল,—থাক্ তবে, আবার কাজ কর্ত্তেই লেগে যাই।

কাজে-কাজেই কাজে বসিয়া গেল।

হাসি মিলাইল সবিতার মুখে। জব্দ করিতে গিয়া নিজেই অপ্রস্তুত। দ্রুতপদে আসিয়া জামাটি ছুঁড়িয়া দিল। আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

বুকের মধ্যে রুদ্ধ কান্নার প্রচণ্ড আবেগ। পথে পড়িয়া মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল।—কান্নায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে।

* * *

ঘরে দাদা আর বৌদি। পুরুষ মানুষ হইলে বৌদির পাকা-দাড়ির বয়স। ওদের সংসারে সবিতা খাটে-খুটে—আর থাকে। একবেলা রান্না। দীর্ঘ অবসর। সময় নাই, অসময় নাই,—বিশুদার ওখানে যাতায়াত।

পা টিপিয়া টিপিয়া আসে, লুকাইয়া চারিদিকে তাকায়, আবার চলিয়া যায়। কিন্তু বিশুদার নজরে পড়িলে অন্যরূপ। তখন আর বিড়ালের পা নয়;—হস্তিনীর। বিশুদা ফিরিয়া তাকায় কিন্তু পরস্পর নির্ব্বাক।

কথা কয় না বলিয়া সবিতার রাগ হয়। অন্যপথে দৃঢ়পদে ঘরে গিয়া ঢোকে! কিন্তু কিই-বা! তখন হাতের কাছে যা পায়! সেলাই করা কাপড়খানার সেলাই ছিঁড়িয়া রাখে, খাবার জল ফেলিয়া দিয়া খালি কলসি উপুড় করিয়া দেয়, লণ্ঠনটা মুচড়াইয়া দুম্‌ড়াইয়া যা-তা করে, গায়ের জামাটা জলে ভিজাইয়া দেয়।—এমনি সব মারাত্মক দৌরাত্ম্য!

বিশুদা অন্যদিকে চাহিয়া বলে, উঃ—দুপুর বেলা একটু হাওয়া নেই …গুমোট।

সবিতা তীরবেগে গিয়া হাতপাখাটি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে থাকে।—তারপর একেবারে জানালার বাহিরে।

কিন্তু বিশুদা না করে প্রশ্ন—না দেয় উত্তর !

সবিতা বদ্‌রাগী। ধূলা লইয়া বিশুদার খাবারে ছড়াইয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়।

ছেলের অবস্থা এখন একটু ভাল। ডাক্তারী ঔষধের গুণ!

বিশুদার আহ্লাদ ধরে না। আধমরা মনে রঙের ছোপ ধরিয়াছে। দিনরাত কাজ করে, আপন মনে গানও গায়।

ছেলের কাছে গিয়া বলিল, ভাল হয়ে কি খাবি গোপাল ?

গোপাল বলিল, ঝোল খাবো—আর—

ঝোল ? পাঁঠার বুঝি ? আচ্ছা তাই তাই।

হাসিয়া আবার বলিল, তোমায় মায়ের নামটি কি ছিল গোপাল ?

মায়ের নাম গোপাল শিখে নাই !

করবী, বুঝলি ?—করবী ! মরে গেছে তবু নাম এখনও কানের মধ্যে সর্ব্বদা—

দালানের কোণে করবীর একটি পাষাণমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। তাহারই হাতের তৈরী। যেন অবিকল ! শুধু প্রাণটুকু চুরি গেছে। সেই হাসি। সেই চুল। সেই হরিণীর মত বড় বড় কালো দুটি চোখ ;—নীলপদ্ম !

বিশুদা বিহ্বল। পাষাণীর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, করবী !

অথচ আজ এতখানি উচ্ছ্বাসের কৈফিয়ৎই বা কি ?

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিশুদা গান গাহিতে গাহিতে তাহাকে আদর করে। দূরে সরিয়া গিয়া বলে, এসো ত গোপালমণি হেঁটে হেঁটে ?

নড়্ বড়্ করিয়া গোপালমণি তাহার কাছে হাঁটিয়া যায়। রোগের পর নূতন পা।

সেদিন সবিতা আসিতেই বিশুদা একেবারে উচ্ছ্বসিত।

দেখ্‌ছ সবিতা দেখ্‌ছ—ছেলে আমার কেমন হাঁটতে পারে ?

দেখেছি—সবিতা বলিল। কিন্তু ফিরিয়াও তাকাইল না।

বিশুদা আপনার আনন্দেই বিভোর। সবিতা বলিল, ছেলে বুঝি খুব আদুরে ?

আদর আর কই কর্ত্তে পারি। ওর মা মরবার পর—তখন আমি আসিনি এদেশে—সেই থেকেই ত ওর রোগ।

বৌ তোমার বুঝি খুব সুন্দরী ছিল ?

সত্যি—খুব। তোমার চাইতেও—না না তা নয়, তবে এই—তোমারই মতন—

কোথায় সে ?

এবারে বিশুদার হাসি,—জানো তুমি, তবু জিজ্ঞেস করছ সবিতা।

সবিতা এদিক ওদিক তাকাইয়া কহিল, রান্না হবে না তোমার ?

দাঁড়াও, আগে যাবো কালী-মন্দিরে পূজো দিতে, তারপর ডাক্তার-খানায়, সেখান থেকে এসে, তবে বাজার হাট—

ছেলের ওপর দরদের যে আর সীমা নেই ?—ফরফর করিয়া সবিতার প্রস্থান।

ছেলেকে একদফা খাওয়াইয়া, বিছানার শোয়াইয়া, জুতা জামা চড়াইয়া বিশুদাও বাহির হইল।

খানিক পরে সবিতা আবার আসিয়া হাজির। কেহ কোথাও নাই। একবার সে চারিদিকে চাহিল। তারপর সমস্ত বাড়ীটাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুমুখে পাষাণ প্রতিমা। একবার দাঁড়াইয়া দেখিল,—ক্রূর দৃষ্টি ! আবার চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—ছেলেটা ঘুমাইতেছে। দুর্ব্বল ছেলে !

বিছানার উপর ঝুঁকিয়া ছেলেকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। টের

না পায়। না ছেলে—না বাইরের লোক। চুরি করিয়া দেখা।—নিজের কাছেই চুরি!

সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল—পারিল না। একটিবার ছেলের গায়ে হাত রাখিল। নরম গা। তুল্ তুল্ করে—এমনি মোলায়েম।

হাত আর সরানো যায় না। যেন বাঁধা পড়িয়াছে।

ধীরে ধীরে তাহাকে সবিতা কোলে তুলিয়া লইল।

মাতৃহীন! অন্ধকার দুর্গম এই চলাচলের পথে পরিত্যক্ত।—অভাগা!

চোখ জ্বালা করিয়া সবিতার চোখে জল গড়াইয়া ছেলের গালে পড়িল। তাহাকে নামাইয়া আবার সে বাহিরে আসিল।

কাজের ফেরতা বিশুদা ফিরিল। দেখে—ছেলে ঘরে নাই! এদিক ওদিক দেখিয়া রান্না ঘরে আসিল—সে এক কাণ্ড। রান্না চড়িয়াছে, কুট্‌নো বাট্‌না,—সব প্রস্তুত। সবিতার কাছে বসিয়া গোপাল খাবার খাইতেছে।

বা—। এমন ত জানতু না? আসবার আগেই যে তুমি—

সবিতা কহিল, আমিই সব আনিয়েছি—আমিই—

আগে যদি জানতুম তুমি এমন করে'—

অনেক কিছুই জানো না তুমি।

তা বটে সবিতা, কিন্তু—এ যে—ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বিশুদা ঘরে উঠিয়া আসিল।

প্রকাণ্ড একটা অভাব চোখের স্মুখে!

নদী ছিল, তরঙ্গ ছিল,—আজ কিছু নাই; শুষ্ক। শীর্ণ রুক্ষ বালির

চড়া—ধূ ধূ! তাহারই ভিতর হইতে আজ একটা ভয়ঙ্কর সরীসৃপ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ক্ষুধা পাইয়াছে তাহার, তৃষ্ণায় জিব বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

বিশুদার গলা বুজিয়া আসিল।

খানিক পরে গোপালের নাম করিয়া সে আবার রান্নাঘরের কাছে আসিল,—আয় রে আয় আমার কাছে।

গোপাল উঠিতেছিল—ঝপ্ করিয়া সবিতা তাহাকে কোলে টানিয়া লইল।—যেতে দেব না।

থাক্ থাক্—তবে থাক্। মায়ের মতন হয়েছে কিনা।—বিশুদা আবার পিছন ফিরিল।

কিন্তু সবিতা তৎক্ষণাৎ কোল হইতে ছেলেকে নামাইয়া দিল। হাতের সব কাজও পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ ছুটিয়া গেল সে কুট্‌নো কুটিবার বঁটিখানার কাছে। কি একটা কুটিতে গিয়া বাঁহাতের একটি আঙুল কাটিয়া ফেলিল। বিশুদার অলক্ষ্যেই।

ফিন্‌কি দিয়া রক্ত!

উঠিয়া আসিল। আঙুলটা দেখাইয়া বলিল, কেটে গেল বঁটিতে। যে ধার—

আহা হা, তাইত—ইস্, আমার জন্যেই ত এমন—বিশুদা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সবিতার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। বলিল, ওষুধ নেই? দাও না, একটু দাও না বেঁধে আঙুলটা ভাল করে'—

নিটোল সুন্দর বাঁ-হাত। বিশুদার হাতের কাছেই হাতখানি সরিয়া

আসিল। চট্ করিয়া বিশুদা সরিয়া গেল। কহিল—কাটার ওষুধ ? দেখি আছে বুঝি আমার কাছে। ছেনি হাতুড়ি নিয়ে কাজ কর্ত্তে হয় কি না—। অনেকটা কাট্‌লো বুঝি ?

হুঁ—অনেক।—সবিতা বলিল—ছুঁতে ঘেন্না করে নাকি আমাকে ?

বিশুদা চলিয়া গেল।

কিন্তু ঔষধ আসিল না।

সবিতা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। তবুও বিশুদার দেখা নাই। তারপর নিজেই সে উঠিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল—চোরের মত বিশুদা বসিয়া আছে।

কই, ওষুধ দিলে না ?—সবিতার কঠিন মুখ আরও কঠিন !

বিশুদা মুখ তুলিল। কহিল—সবিতা, তুমি যাও।

যাবই ত। ওষুধটা দিই আগে।—ডান-হাতে ছিল খানিকটা নুন, তাহাই সবিতা ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিল।

ব্যাকুল হইয়া বিশুদা একবার তাহার হাতটা ধরিতে গেল—কিন্তু ধরিল না, নিজেই আবার সরিয়া আসিল।

যন্ত্রণায় বিকৃত সবিতার মুখ ! হাসিয়া কহিল—এতেই সার্‌বে।

রুদ্ধকণ্ঠে বিশুদা ছেলেকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। চোখের সুমুখে তাহার সব ধোঁয়া।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দ !

বিশুদা স্নান করিতে আসিল। দেখে,—মুখ গুঁজিয়া সবিতা রান্না-ঘরের দ্বারে বসিয়া আছে,—কোথাও যায় নাই !

কাছে আসিয়া কহিল—কি হ'ল আবার ?

উত্তর নাই।

রান্নাঘরে বিশুদা উঁকি মারিল—কিছু বুঝিল না। পাশ কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিল।

একেবারে অবাক। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিল,—ডাল, ভাত, তরকারি, দুধ, মিষ্টি চারিদিকে ছড়ানো। উনানে জল ঢালা,—ঘরময় ছাই উড়িয়া অন্ধকার। থালা, ঘটিবাটি এখানে ওখানে গড়াগড়ি। চারিদিক একাকার—মৈ-মাড়ন্।

কিন্তু বিশুদা বাহির হইবার অবসর পাইল না। অকস্মাৎ সবিতা উঠিল; দুই হাতে দরজার দুইটা কবাট ধরিয়া পথ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

তেমনি করিয়া অধর চাপিয়া মেয়েটার টিপি টিপি নির্ব্বাক হাসি!

বিশুদা কহিল—বল না কি চাও? বল না?

সবিতা কথা কয় না—শুধু হাসে।

থাকো তবে দাঁড়িয়ে; আমিও বসে থাকি এইখানে।

তাই থাকো।—কপাট দুইটা টানিয়া শিকল বন্ধ করিয়া সবিতা প্রস্থান করিল।

বন্ধ দরজায় বিশুদা হাত চাপ্ড়াইতে লাগিল—খোল' সবিতা খোল, দরজা খুলে দাও—

খানিকক্ষণ পরে—

ঝন্ ঝন্ করিয়া শিকল খুলিয়া গেল।

কিন্তু সবিতা নয়—অম্বা! একেবারে মুখোমুখি।

অম্বা হাসি চাপিল—শেকল দিয়ে গেল কে তোমায় বিশুদা?

কি জানি ভাই, বোধ হয় সবিতাই হবে। যেমন ছেলে-মানুষী কাণ্ড তোমাদের !

তা বলে' একেবারে শেকল ? আমাকেও হার মানালে যে !—অম্বা কিন্তু রান্নাঘরের ভিতর তাকাইল না।

তোমার সবিতা বন্ধুটি কোথায় গেল, অম্বা-দিদি ?

তা ত জানি নে।

বিশুদা নীরব। অম্বা কহিল, ছেলেটা কাঁদছিলো যে এতক্ষণ !

কাঁদুকে গে ভাই। দিনরাত ওর কথা আর ভাল লাগে না।—বিশুদা ইঁদারার কাছে গিয়া বসিল।

অম্বারও যেন অন্য কাজ আছে। ঘরের ভিতর উঠিয়া আসিল। ছেলে ততক্ষণে শান্ত !

তাহার কাছে আসিয়া বসিল। গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল, ভাল আছ ?

গোপাল ঘাড় নাড়িল।

আসবে আমার কোলে ?—অম্বা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। পরে ছেলের মুখের উপর নিজের মুখ রাখিল। তারপর গাল দুটি ধরিয়া কহিল—বড় হয়ে আমায় কি বলে ডাকবে ?

ছেলে মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কথা বলে না।

নাম ধরে' ডেকো, কেমন ? ছেলেকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিল, এমনি করে' আমাকেও খুব আদর করো, বুঝলে ?

একবার ছেলেকে নামাইয়া দেয়—আবার কোলে তুলিয়া লয়। এম্‌নি বার বার !

সমস্ত হৃদয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া ছেলেটিকে জড়াইয়া ধরে। বুকের উপর যেন পিষিয়া মারে।

বার বার সে শুধু মাত্র অনুভব করিতে চায়—সে নারী!

আর যাহাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে—সে পুরুষ!

অম্বা একেবারে বিহ্বল! ঘুরায় ফিরায় দোলায়—আর ছেলেকে দেখে। আবার আদর করে। তারপর যত্ন করিয়া নামাইয়া দিল।

যাইবার সময় দেখে—ইঁদারার পাড়ে বসিয়া বিশুদা। মুখোমুখি হইল, কিন্তু কথা বলিবার মন কাহারও নয়।

আহ্লাদীর বিয়ে—। রেবার নাম আহ্লাদী। যে শুনিল সেই গেল। আহ্লাদী বড় আদরের!

ছেলে-কাঁধে বিশুদাও গেল।—রেবাঁদিদির সশরীরে নিমন্ত্রণ!

গেল না মুন্না। কোন্ পরিচ্ছদটি পরিয়া গেলে তাহাকে সুন্দর দেখাইবে—তাহা সে অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে বসিয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই তাহার পছন্দ হইল না। তখন বলিল, একটা আঁক্ নিয়ে ব্যস্ত আছি। তাছাড়া যারা হ্যাংলার মত নেমন্তন্ন খেতে যায়, আমি তাদের ঘৃণা করি। বাবার এক মক্কেল বলেন—

বাবার মক্কেলকে কেহ গ্রাহ্য করে না!

আর গেল না সবিতা। তাহার বাড়ীর সকলে গেল। সেও বাহির হইল কিন্তু মাঝপথ হইতেই ফিরিল।

নিমন্ত্রণ সারিয়া বিশুদা ফিরিল। কাঁধে গোপাল।—অনেক রাত।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল—রাঙা আলো! প্রদীপের নয়,—আগুনের আভা! চারিদিকে পোড়া গন্ধ!

সে কি !—বিশুদা ঘরের কাছে আসিল। অকস্মাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। পট্ পট্ করিয়া শব্দ। ভিতরে আগুন। আর সেই আগুনের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আগুনেরই শিখা,—সবিতা!

গোপালকে এক জায়গায় নামাইয়া বিশুদা ছুটিয়া আসিল।—সরো সরো, পথ ছাড়ো—ছারখার হয়ে গেল যে!

সবিতা পথ ছাড়িল না। দুই হাতে ঘরের পথ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। কহিল—যাক্।

পুড়ে যাবে অম্‌নি করে' ঘর দোর জিনিস পত্তর ?

হ্যাঁ পুড়ুক্। বাইরের আগুনটাই কি এত বড় ?

বিশুদা ছট্‌ফট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল কিন্তু সবিতা পথ দিল না। ততক্ষণে ঘরের যা কিছু সব পুড়িয়া গেছে।

হাওয়া পাইলে আগুন উড়িয়া বেড়ায়। একপাশে ছিল করবীর প্রতিমা। অতি যত্নে পাষাণ মূর্ত্তিতে কাপড় চোপড় পরানো। তাহাতেও আগুন ধরিল। বিশুদা ঘুরিয়া যাইতেই সবিতা তীরবেগে গিয়া পথ আগ্‌লাইল।

পথ ছাড়ো সবিতা—পথ ছাড়ো, পায়ে ধরি তোমার—

সুন্দর সুডৌল ডান-পাখানি সবিতা বাড়াইল—ধরো পায়ে!

পায়ে আল্‌তার দাগ। তাহাও আগুনের রঙ্। বিশুদা পিছাইয়া গেল। সবিতা হাসিয়া কহিল, এখনও ছোঁবে না? ছুঁলে দোষ হয় বুঝি ?

করবীর মূর্ত্তি ততক্ষণে পুড়িয়া পুড়িয়া কালো। বিশুদা কাঁপিতেছিল। বলিল, হ্যাঁ।

তবে ছেলে পাবে না—যাও। আমার ছেলে।—হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া সবিতা গোপালকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

বিশুদা আর পারিল না। ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গোপালের একটা হাত ধরিল। বলিয়া উঠিল—ছেলে তোমার নয়, আমার।—হাত ধরিয়া সে গোপালকে টানিয়া লইল।

তোমার ?—বেশ !—সবিতা নিঃশব্দে চারিদিকে একবার তাকাইল তারপর অন্ধকারে বাহিরে আসিয়া পথে নামিল। দুই চোখে তার দুই ফোঁটা আগুন।

ওদিকেও আগুনের ক্ষুধা মিটিতে চায় না। পাথরের ঘর—তবু জ্বলিতে থাকে।

গোপাল ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। বিশুদা তাহাকে বুকে লইয়া আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

* * *

মন দিয়া বিশুদা আবার কাজ করে। কিন্তু মন থাকে না।

কোথায় অসমাপ্ত মন্দির। তাগিদের পর তাগিদ আসে সেখান হইতে। কিন্তু কাজ কর্ম্মে বড় গোলমাল হইতে লাগিল। ভিতরের শিল্পী যেন পথ ভুলিয়া অন্যপথে গেছে।

তবু চেষ্টার অন্ত নাই।

যন্ত্রপাতি লইয়া বিশুদা আবার বসিল। আবার করবীর মূর্ত্তি গড়িতে হইবে !

পাথর খোদাই চলিতে লাগিল।

করবী !—স্বপ্ন শুধু করবীকে লইয়াই। মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম !

দেহের সব গড়নগুলি ঠিক ঠিক হইল,—মুখখানি কেবল বাকি। যত গোলমাল এই খানেই।

ছেনি দিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া দাগ কাটিতে থাকে আর মানসসরোবরের দিকে তাকায়।

চুলগুলি তেমনি হয়, কিন্তু কপালটি ? ভুরু দুটি ত হইল না!—আবার কারিকুরি চলিতে থাকে।

চোখ দুটি হয়। নাকটিও এক রকম করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঠোঁট দুটি ? হাসিটি ?—বিশুদার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে।

কি যেন কোথায় হারাইয়া গেছে!—

ক্লান্ত মন! ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি—সুনিবিড়। উপরে দ্যুতিপাণ্ডুর আকাশে ফট্‌ফটে তারা। কোটি কোটি দীপ্ত চক্ষু শুধু তাহারই দিকে। বিবশ-বিহ্বল চাঁদের আলো ব্যথায় আতুর। দূরে অস্পষ্ট শাদা বাড়ীগুলি মায়াপুরীর মত!—বিশুদার অর্দ্ধজাগ্রত দৃষ্টি কাঁপিতে থাকে।......ভুখারী অন্তরাত্মা বন্দীশালার বন্ধ দুয়ার আঁচ্‌ড়ায়। পাথরে দাগ কাটে।

তা হ'ক—। বিশুদা আবার ফিরিয়া আসিল। আলো জ্বালিল। তারপর একমনে বসিয়া গেল।

কাজ শেষ হইল; মোরগও ডাকিল।

নিখুঁৎ মূর্ত্তি এইবার। চমৎকার! ধ্যান আসিয়া আকারে ধরা দিল।

ম্লান প্রদীপ ম্লানতর হইয়া নিবিয়া গেল।

দিনের অস্পষ্ট আলো—

ক্লান্ত চক্ষুদুটি রগড়াইয়া বিশুদা উঠিয়া দাঁড়াইল। এক মুখ হাসি! সমস্ত ক্ষোভ মুছিয়া গেছে।

বাহিরে গেল। মুখে চোখে জল দিল। ছেলেটা তখনও অকাতরে ঘুমাইতেছে।

.........সুন্দর প্রভাত! দূরে উষসীর শুভ্র ললাটে ব্যাধের বাণ বিঁধিয়া রক্ত ঝরিতেছে। আরক্ত মুখখানিতে শুকতারার উজ্জ্বল অশ্রু-বিন্দুটি!—পাখী ডাকে না? সলজ্জ মধুর গন্ধটুকু কার? নিশিগন্ধার শেষ মিনতি বুঝি?

বাকি কাজটুকু সারিতে সে আবার বসিল।

কিন্তু একি! অকস্মাৎ বিশুদা শিহরিয়া উঠিল।

সদ্য-সমাপ্ত মূর্ত্তিটি,—এ ত' করবীর নয়! কে এ?

অথচ চেনা মুখ, চেনা দুটি চোখ, চেনা হাসি,—সবই চেনা!—কিন্তু করবী ত নয়!

সমস্ত হৃদয়, সমস্ত মন দিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিল—সে যে সবিতা! সবিতাই ত বটে! বিশুদা উন্মাদের মত উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। কপালের শিরাগুলি স্ফীত, ক্ষুরধার দৃষ্টি। নিজের কাছে নিজে অপরাধী

নিজের ভিতরেই কি একটা ঘুমভাঙ্গা বস্তুর প্রতি সে তাকাইতে লাগিল।

এবার বিশুদার পথের জীবন। ঘর দোর আর ভাল লাগে না।—প্রলোভনের পঙ্কিল বাতাসে বিষজর্জ্জর।

ঘরে অক্ষম দুর্ব্বল সন্তান। তাও যেন একঘেয়ে।

সে চায় দূর-দুর্গম পথ। নিজের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা।

কিন্তু ক্ষুধা আছে—তৃষ্ণা আছে। ছেলেটার তদ্বিরও দরকার।

সারাদিন বাদে ঘরে ফিরিল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল—ভিতরে চীৎকার !

অম্বার গলা। বিশুদা ছুটিয়া ঘরে আসিল। অম্বা ছুটাছুটি করিতেছে। বলিল, শিগ্‌গীর দেখ বিশুদা, ছেলে কেমন কচ্ছে। আমি এসে দেখি যে—

বিশুদার পা অবশ। দেখে—ছেলেটা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, হাত পা বাঁকিয়া গেছে, মুখ দিয়া শব্দ বাহির হয় না,—দুইটা চোখই কপালে তুলিয়াছে।

ডাক্তার! কিন্তু কেই-বা ডাক্তার ডাকে। ছেলেকে চাপিয়া ধরিয়া বিশুদা চীৎকার করিল—গোপাল ?

আর গোপাল! ঘরময় শুধু তার বিদ্রূপাত্মক প্রতিধ্বনি। ছেলের তখন শেষ অবস্থা। শক্ত শীর্ণ আঙুলগুলি দিয়া পিতাকে আঁকড়াইতে চাহিল, প্রাণপণে সাড়া দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু শক্তি কই! বিছানার উপর আবাব ঢলিয়া পড়িল। নিঃশব্দ—নিস্পন্দ।

বিশুদা, ও বিশুদা—ছেলে গেল যে ?

বিশুদা পাথর। মরা ছেলেকে অম্বা জাপ্‌টাইয়া ধরিল। বলিল—ও বিশুদা, শুন্‌চ ?

শুন্‌চি—তা আমি কি করব অম্বা ? গেল মরে! গেল ত গেল… যাক্‌। আমি কি করব!

ঘার নাড়িতে নাড়িতে বিশুদা চলিয়া গেল।

অম্বা ত কাঁদে না,—কাঁপে!

তারপর—। সে কথা কেহ ভাবে নাই। বিশুদার বিদায়।

অলক্ষ্যে বিশুদা বাহির হইল। হাতে একটি পুঁটুলি।—সন্ধ্যাকাল।

বাঁ-হাতি রাস্তায় নামিয়া বরাবর গঙ্গার পথে। রাস্তায় তখনও আলো জ্বলে নাই।

অনেকদূর গিয়া ডান দিকে। রাস্তাটি একেবারে গঙ্গার কোলে গিয়া মিশিয়াছে।

ঘাটে নামিয়া চুপ করিয়া বিশুদা দাঁড়াইল। নদীর ওপারে পূর্ণিমার চাঁদ। সুমুখে জল স্থির,—ভিতরে শুধু অবিরাম কল্‌কল্ শব্দ। সোনার মত চাঁদের আলো তাহারই উপর।

ঘাট জনহীন। শুধু দূরে একটা জ্বলন্ত চিতা। তাহারই কাছে বসিয়া একটা হিন্দুস্থানী কানে হাত চাপিয়া দেহতত্ত্বের গান করিতেছিল।

চিতা!—আর একটা উহারই পাশে। ওইটিতে তাহার সংসারের একটি মাত্র বন্ধন জ্বলিয়া পুড়িয়া গেছে!

পিছনে কে দাঁড়াইয়া!—এ কি, সবিতা!

আসছিলে বুঝি পেছনে পেছনে?

হুঁ।

যেন উন্মাদিনী! উপর দিয়া ঝড় গেছে, ঝঞ্ঝা গেছে,—প্রলয় গেছে।

কি চাও সবিতা?

অব্যক্তকণ্ঠে সবিতা কহিল—আমিই মেরেছি, আমিই—বিষ খাইয়ে—

বিশুদা ফিরিয়া তাকাইল। অকস্মাৎ হো হো করিয়া হাসি—তাই নাকি? বিশ্বাস কর্ত্তে হবে এ কথা?

বিশুদা সব পারে—এ-কথাটি শুধু বিশ্বাস করিতে পারে না!

ধূলা-বালির উপর সবিতা বসিয়া পড়িল। বিশুদা কহিল, শেষ বেলায় সে ত অম্বাকে ডাকে নি—আমি জানি—তোমাকেই সে চেয়েছিলো। সবিতা, তুমিই তার মা।

সবিতা পা ছুঁইবার চেষ্টা করিতেই বিশুদা সরিয়া দাঁড়াইল—ছোঁবার সময় এখনও আসে নি, সবিতা।

অস্ফুটকণ্ঠে সবিতা কহিল—শাস্তি দাও।

শাস্তি! বিশুদা হাসিল,—তোমাকে ত জানি সবিতা, নিজেকেও চিনেছি। দেবতা ত নই!

নিঃশব্দে উঠিয়া সবিতা আপনার পথে চলিয়া গেল।—অভিমানিনী!

কিন্তু এ জীবনে বাসনাই বা কি তাহার!

এই যে নৌকা! কোথায় ছিল এতক্ষণ!—ওগো মাঝি, পার করবে? আর যে দাঁড়াতে পারি না।

দূর হইতে শব্দ আসিল, করব গো করব, ব্যস্ত কেন? ওই ত কাজ আমার!

ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়িল। দুইজন নামিয়া আসিল। রেবা আর নির্ম্মল—রেবার বর।

এ কি—বিশুদা? কোথায়?

পারে যাবো ভাই,—ওই রামনগরে। কাজের চেষ্টায়—

নির্ম্মল দাঁড়াইয়া রহিল। রেবা আসিয়া তাহার হাত ধরিল—আর আসবে না বিশুদা?

আসবো বৈকি দিদি,—যাওয়া আসাই ত সম্বল!—ও মাঝি, রাত হল যে।

চল না বাছা, বসেই আছি ত তোমার জন্যে। তুমিই মায়া কাটাতে পাচ্ছ না!

হেঁট হইয়া রেবা বিশুদার পায়ের ধুলা লইল। আনন্দ ছুঁইল বেদনার পা দুটি! মৃত্যুর পায়ে জীবন মাথা ঠেকাইল!

কি কাজ সেখানে করবে বিশুদা?

এই যা হক একটা—না না, পাথরের কাজ আর নয়, দিদি। ওটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ওসব আর নয়।

মাঝ নদী—। চাঁদের আলোয় আব্ছা দুই তীর। উপরে আকাশ।

কত দেবে গো?

দিয়েছি ত ভাই তোমার পাওনা।

ওতে হবে না।

হবে না?—নাও তবে এই পুঁটুলিটা?

ওটা ত পুঁটুলি।—জঞ্জাল একটা।

বিশুদার দৃষ্টি উপর দিকে। মুখ তুলিয়া রহিল—সবই ত দিলাম—যা কিছু ছিল,—সব। আর ত কিছু নেই!

চল তবে,—কি আর করি। পার করতে হবে ত!

*   *   *   *

আর এদিকে—।

পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘর!—

বাণ-বিদ্ধা একজন মাটিতে লুটাইয়া দুই হাতে বুক মুচ্ড়াইয়া ছট্ফট্ করে। বুক মরুভূমি—কিম্বা পাথর! আঁচড়ায় শুধু, জল নাই! চীৎকার করিতে যায়—কণ্ঠস্বর নাই!

সবিতার প্রেতাত্মা !

আর একজন ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ; নিশি-পাওয়ার মত !—অম্বার ছায়া !

ওদের কে পার করে ?

ছি ছি

পাড়া গাঁ নয়—শুধু পাড়া ; শহরের কাছেই। 'ডেলি প্যাসেঞ্জারের' কৃপায় টাট্‌কা খবর রেলে চড়িয়া আসে। আবহাওয়াটা এমনিই।

ব্যাপারটা যে শোনে সেই ছি ছি করে। তা তলাইয়া কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক।

ঘটনাটা পাড়ার মধ্যেই। কে একটা ছোকরা নাকি একটি মেয়েকে লইয়া কলাবাগানের সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা আশ্রয় করিয়াছে। মেয়েটীর মাথায় সিঁদুর নাই কিন্তু নীলাম্বরী পরে।

অনেকে কানাকানি করিয়া বলিল—দেখেছি হে, ছোঁড়াটাকে কল-কাতার শহরে ঘুরতে দেখেছি—ওই আমাদের অফিস-পাড়ায়।

একজন বলিল—আমিও যেন দেখলাম একদিন ; স্বদিশীস্বদিশী ভাব,—লক্ষীছাড়া চেহারা—রুক্ষ !

একটা মানুষকে ঘিরিয়া এমনি আন্দোলন চলে।

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই।

খবরটা মেজ বৌও শুনিল। তার মন্তব্য শুনিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। লেখা-পড়া-জানা মেয়ে।

বলিল—এত বড় আস্পর্দ্ধা! এই পাড়ায় সকলের মাঝখানে এসে একটা বিধবাকে নিয়ে—শাস্তির ভয় নেই? অপমানের ভয় নেই?

সে যেন সমাজ-রীতির জ্বলন্ত শিখা!

ভাসুর-পো থাকে পাশের ঘরে। নাম ভানু। আজ বিশ বছর কি একটা রোগে পঙ্গু হইয়া আছে। সেও বসিয়া বসিয়া বাহিরে আসিয়া বলিয়া গেল—রোগটা যদি আমার না হত, দেখে নিতাম বেটাকে।

সে মনে করে, রুগ্ন না হইলে সে পৃথিবী জয় করিতে পারিত।

আলো জ্বালিয়া, সন্ধ্যা দিয়া মেজ বৌ তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া বলিল—সুবোধ জেগে আছিস্—সুবোধ?

সুবোধ বিছানায় শুইয়া ছিল। বলিল—কেন?

তুই কি কেবলই ঘুমুবি? ঘুম ভিন্ন কাজ নেই তোর?

না। কি বলচিস্—বল্ না?

বাহিরে তখনও গোলমাল মিটে নাই। সেই দিকে তাকাইয়া সুবোধ বলিল—ব্যাপার কি রে চন্দ্রা?

চন্দ্রা তাহার প্রায় সমবয়সী বৈমাত্রেয় বড় বোন। কখনও নাম ধরে—কখনও বা দিদি বলে। মা-বাপ নাই। বোনের শ্বশুরবাড়ী ভাই আসিয়াছিল কালীপূজা বাবদে—আর যায় নাই। কোথাও গেলে সে আর নড়িতে চায় না। যেখানে সেখানে গিয়া থাকিতে তাহার লজ্জা করে।

চন্দ্রা বলিল—ছাখ না বাইরে গিয়ে। ঘরের বাইরে এত বড় পৃথিবীতে কি তোর কোনও কাজ নেই?

উঠিয়া আসিয়া সুবোধ কহিল—কি, হল কি?

চন্দ্রা তাহাকে সব খুলিয়া বলিল। সুবোধ কহিল—ভারি অন্যায় ত।

চন্দ্রা কহিল—এত বড় সাহস কার? এই বামুন-পণ্ডিতের পাড়ায়, —একবার দেখে আয় ত। সব ঠিক ঠিক বলবি কিন্তু।

সুবোধ কহিল—সে যদি তার স্ত্রীই হয়?

স্ত্রী হলে ক্ষেতি নেই—কিন্তু বিধবা স্ত্রী হবে কোন্ সাহসে? যা তুই একবার।

জামা কাপড় পরাইয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া চন্দ্রা সুবোধকে বাহিরে পাঠাইল।

ঘণ্টাখানেক বাদে সুবোধ ফিরিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রা তাহারই অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়া বসিয়া ছিল। গলা বাড়াইয়া বলিল—আড়ালে কেন? সুমুখে আয়।

অপরাধীর মত সুবোধ সরিয়া আসিল।

কি হল,—যা শুনলাম—সত্যি

হল না।

হল না কি? যাস্ নি বুঝি? এমন ভীতু—এমন লাজুক তুই?—এতক্ষণের রাগটা সুবোধের উপরেই পড়িল,—মানুষের সাম্‌নে গিয়ে কি কোন দিন দাঁড়াতে শিখবি নে? ঘরই চিনেচিস শুধু, মেয়েদের মতন?

সুবোধ কহিল—গেলাম ত।

কদ্দূর? গিয়ে আবার ফিরলি কেন?

বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সুবোধ বলিয়া উঠিল—কি বলতে হবে শিখিয়ে দিয়েছিলি তুই যাবার সময়?

ও হরি! এই তোমার ইংরিজি লেখা-পড়া শেখা?

কথায় কথায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং পুরুষের পৌরুষকে খাটো করা চন্দ্রার একটা কাজ ছিল।

সুবোধ বেচারা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। না পারে কথা কহিতে— না পারে ঘরের বাহির হইতে। দুনিয়ার যে দিকটায় কোলাহল, ও যেন তার আড়ালে থাকিতে চায়।

শুধু তাই নয়। মানুষের যে-কোনও একটা অন্যায় দেখিলেই তাহার লজ্জা করে। ও-পাড়ায় কে বিধবাকে লইয়া ঘর করিতেছে,—তাহার লজ্জার একশেষ! সেদিন শহর হইতে ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছিল, —লজ্জায় সুবোধ দুই দিন মুখ দেখায় নাই।

চন্দ্রা এক সময় ডাকিয়া বলিল—সারাদিনই যে তোর কুম্ড়োর মাচা নিয়ে কেটে গেল রে? বাড়ী ঢুক্‌বি নে?

ঘরের পাশেই ছোট্ট বাগান। সেখান হইতে মুখ তুলিয়া সুবোধ কহিল—কেন রে?

নন্দর বৌ তোকে ডাকছিলো একবার।

আমাকে?

হ্যাঁ। ওই যে তার একখানা চিঠিতে ঠিকানাটা লিখে দেবার জন্যে। ছাখ্‌ না—হয়ত বাইরে এখনও বসে আছে।

সুবোধ লুকাইয়া ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল, না—না, তুই বল্‌গে যা ভাই, বল্‌ আমি ঘুমুচ্ছি। ও-সব আমি পারি না—লজ্জা করে।

তার নিজের ঘরটিই পৃথিবী; আর সব অন্ধকার!

চন্দ্রা চুপ করিয়া রহিল। সুবোধ ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সেদিনকার কথাটা পাড়িল। বলিল—আমিও ভাবচি,

এত বড় অন্যায়টা কি চেপে যাওয়া উচিত ? ও-সব লোককে আস্কারা দেওয়া—তুই-ই বল্ না দিদি ?

চন্দ্রা কহিল—তোর এ সব কথায় থাকবার দরকার নেই।

না, তাই বলচি, তুই সেদিন বলছিলি কি না ; আর আমিও ভেবে দেখলাম, উঃ কি অন্যায় ! ইচ্ছে করে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই।—বলিয়া সে বিছানায় গিয়া ঢুকিল।

চন্দ্রা বলিল—কার মাথা ?

ওই হতভাগা,—ওই যার বৌ বিধবা ?

কেন ? কিই-বা দোষ করেছে সে ? দুজনের সুখ-শান্তির জন্যে বিয়ে যদি তাদের হয়েই থাকে,—অন্যায়টা কি ?

অন্যায় নয় ? খুব অন্যায়, একশো বার—হঠাৎ দিদির মুখের দিকে চাহিয়া সুবোধ বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, না হয় ধরে নেওয়া গেল—

কিন্তু কথা বাড়াইতে আর তাহার সাহস হইল না। ফস্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

শহরের রাস্তাটা সটান্ সিধা গিয়াছে। তাহারই এক পাশ দিয়া সুবোধ এম্নি খানিকটা চলিতেছিল। সে এমন যায় প্রায় রোজই। বেশি দূর যায় না—খানিকটা ঘুরিয়া ঘরে আসিয়া ঢোকে। লোকের ভিড় দেখিলে তাহার মাথা গোলমাল হইয়া যায়।

ফিরিবার মুখে নজরে পড়িল, একটি লোক ছোট একটি মুদির দোকানের সুমুখে দাঁড়াইয়া জামার পকেট হাতড়াইতেছে।

পুরুষ মানুষের এমন অপরূপ সুন্দর চেহারা সুবোধ আর কখনও দেখে নাই। সৌন্দর্য্যের পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্য্য—এ যেন বিধাতার দান নয়,—

তাঁহার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে এ যেন ডাকাতি।

হাতের ইসারা করিয়া লোকটা হঠাৎ সুবোধকে ডাকিল। সে ডাক উপেক্ষা করিবার নয়।

কাছে গিয়া সুবোধ কহিল—কি বলচেন?

আনা চারেক পয়সা দিতে পারো?

চার আনা! আনা দুই আছে—নেবেন?

দোকানি অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। লোকটা বলিল—চাল কি না; কিন্তু—কম পয়সায়, আচ্ছা দাও, দু আনাই দাও,—সিগারেট কেনা আর হবে না দেখছি।

সুবোধ পয়সা বাহির করিয়া দিল। সবচেয়ে মূল্যবান যদি কোনও বস্তু তাহার নিকট থাকিত, তৎক্ষণাৎ সে বাহির করিয়া দিত।

লোকটা হাসিতে হাসিতে পান সিগারেট কিনিতে লাগিল। সুবোধ পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল।

পরণে এই শীতের দিনে একটি ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি, ময়লা একখানি বিলাতী কাপড়। রুক্ষ মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে এক পরদা ময়লা। ছেঁড়া জুতার ফাঁক দিয়া পায়ের আঙুল বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। তবুও তাহার সেই জ্যোতিষ্মান দেহে কোথাও রূপের কার্পণ্য নাই।

সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল—দেবো আর একদিন তোমার পয়সা দু আনা। এ রাস্তায় আবার দেখতে পাবো ত?—আসি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে শুরু করিল।

সুবোধেরও ওই পথ—।

অনেকদূর পর্য্যন্ত লোকটি নিজের মনেই চলিতে লাগিল, একবার পিছন ফিরিয়াও চাহিল না।

সুবোধের মনে হইতে লাগিল, লোকটির চলনের ভঙ্গিটিতেও যেন একটা চুম্বক আছে।

ক্রমে রাস্তা জনশূন্য হইয়া আসিল। সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুইধারে গাছের ছায়ায় ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দুজনেরই পায়ের শব্দ হয়।

লোকটি হঠাৎ পিছন ফিরিল। সুবোধকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—তুমিই না দু আনা পয়সা দিলে একটু আগে ?

সুবোধের কথা বাহির হইল না। মুখ তুলিয়া বোকার মত চাহিল।

তুমি বটে !—লোকটি হাসিয়া আবার বলিল—পুলিশের গোয়েন্দা হলে এ সময় অন্ততঃ বেশ কায়দা করে একটা জবাব দিত। তাদের ঠেঙে এমন অনেক পয়সা নিয়েছি কি না। আর তাছাড়া ভুলে যাওয়াই বা আশ্চর্য্য কি ! এমনি হয়। সেই মুদির দোকানের সুমুখে যদি কোন দিন তোমাকে দেখতাম তবেই মনে পড়ত ; সেইখানেই তুমি একান্ত ; আর নৈলে মানুষের স্রোতে মিশে গেলে,—তখন তোমার কোনও পরিচয় নেই।

সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। লোকটি যেন এক মুহূর্ত্তে তাহকে চিনিয়া ফেলিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিল—আজ তুমি যে আমার একটুখানি উপকার করলে, এর জন্যে কোন দিন গর্ব্ব করো ভাই। এ তোমার গৌরব ! আজ তুমি ধন্য হয়ে গেলে !

সুবোধ যেন তাহার কথাগুলি গিলিতে লাগিল। মুখে কহিল—কোন্ দিকে যাবেন ?

মুখ বিকৃত করিয়া লোকটা সহসা বলিল—ছি ছ, এই তোমার

কথা ? কোন্ দিকে যাবো, আমরা কে, কি নাম আমাদের, কি করি—এ সব প্রশ্ন কেন মনে আসে ? আমরা আছি—শুধু এইটুকু জেনে রেখো। চললাম।

গলির একটা বাঁকে মোড় ফিরিয়া সে চলিতে লাগিল।

সুবোধ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর গলা বাড়াইয়া বলিল—কাল আবার দেখা হবে কি ?

অন্ধকারে লোকটা গলার শব্দ করিয়া হাসিল। কহিল—হবে বৈ কি ! পয়সা দু আনা দিয়ে তুমি যে আমায় কিনে রাখলে !

সুবোধের মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল।

খানিকদূর গিয়াছে—পিছন হইতে লোকটি আবার আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিল। সুবোধ বিমূঢ়ের মত বলিল—এ কি…আবার আপনি…?

লোকটি কহিল—মানুষকে আঘাত দিতে ভাল লাগে; কিন্তু চোখেও আবার জল আসে—দেখবে ?

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই লোকটা তাহার বড় বড় দুইটা চোখে স্পষ্ট হু হু করিয়া জল আনিয়া ফেলিল। তার পর বলিল—তোমার যখন ইচ্ছে এস. ওই কলাবাগানে—

কলাবাগানে ! কোন্ বাড়ী ?

সে হাসিয়া বলিল—ওই ত একটিই বাড়ী ভাই কলাবাগানে…কখন্ হুড়মুড় করে পড়ে। ওদিকে শেয়াল-কুকুরের বাস, আর এক দিকে—তোমার চম্‌কাবার কারণ আমি জানি।—বলিতে বলিতে লোকটা আবার গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু হজম করা শক্ত। বিশেষতঃ চন্দ্রার পক্ষে। কিন্তু এ যুগে প্রতিপক্ষে দাঁড়াইবার মত কেই বা আছে। তবু এর গুরুত্বটা চন্দ্রাই যেন বেশি করিয়া নিজের ঘাড়ে লইল।

দেবর ও ভাসুরের চার পাঁচটি ছেলে-পুলে। কেহ স্কুলে, কেহ-বা কলেজে পড়ে। যে ছেলেটি এবার বি-এ পরীক্ষা দিবে, সে কহিল—ননসেন্স! ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগে এসব তোমার কি রকম কথা, মেজখুড়ি?

চন্দ্রা রাগে ফুলিতে লাগিল; কিন্তু ছেলেরা তাহার সমবয়সী,—কিই-বা বলা যায়!

বদ্ধ ঘরের জানালায় মুখ বাড়াইয়া ভানু সবই দেখিতেছিল; এবার হাতের উপর ভর দিয়া কোনও রকমে বাহিরে আসিয়া বলিল—খুড়িমা, আপনি আমার মায়ের মতন—মার চেয়েও বেশি—আমি যদি ভাল থাকতাম তাহলে দেখতেন—দেখতেন তাহলে ওর ওই সাহসের কত বড় শাস্তি—শাস্তি দিতাম। কি বলব—কি বলব খুড়িমা, আপনার ওই সোনার মুখখানিতে আমি—আমি হাসি ফুটিয়ে দিতাম। কিন্তু—

সেই অকর্ম্মণ্য, পঙ্গু, পরিত্যক্ত, ত্রিশ বছরের জোয়ান ছেলেটি ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চন্দ্রার চোখেও হয় ত তখন জল দেখা দিয়াছে। কাছে আসিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—দীর্ঘজীবী হও বাবা, তুমিই আমার মান রাখলে।

সেই কদাকার, শীর্ণ, অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলিয়া হঠাৎ ভানু বলিল—কি বললে?

চন্দ্রা চুপ।

হাতের উপর ভর দিয়া কোনওরূপে ভানু আবার ঘরের ভিতর গেল। ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া, চীৎকার করিয়া, কাঁদিয়া, মাথার চুল ছিঁড়িয়া বলিয়া উঠিল—তুমি আমার দীর্ঘজীবী হতে বল? আমার কেন মারলে না, কেন খুন—খুন করলে না; ও কথা—ও কথা কেন বললে তুমি?

তার সে কি ভীষণ চীৎকার আর কান্না! দেহের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া তাহার বন্দী নিপীড়িত আত্মা যেন বাহিরে আসিয়া মাথা কুটিতে চায়।

কিসে কি হইল। এক মুহূর্ত্তে বাড়ীর মধ্যে যেন কি কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

সুবোধের সব কিছু একেবারে বিশৃঙ্খল! এ যেন কোথাকার একটা ঝড়ো হাওয়া আসিয়া তাহার সব ওলোট পালট করিয়া দিল।

দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি—সব যেন নিতান্ত একঘেয়ে। চন্‌চন্ করিয়া শুধু শুধু এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ধরা পড়িয়া গেল।

গলার আওয়াজে পিছন ফিরিয়া দেখিল, লোকটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। কাছে আসিয়া বলিল—চলে যাচ্ছ যে? লজ্জা কেন অত?

না, লজ্জা আর কি!

সে কহিল—তোমার বৌদি ডাকচেন তোমাকে।

বৌদি! আমার বৌদি ত নেই!

আছে বৈ কি! এত বড় পৃথিবীতে খুঁজে পেতে দেখলে এক-

আধটা বৌদিও কি মেলে না ?—বলিয়া সুবোধের হাত ধরিয়া বলিল—একটা দাদাঁও মিলে যেতে পারে—এস।

কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সুবোধকে সে লইয়া গেল।

লোকটাকে ভালও লাগে—আবার ভয়ও করে।

কলাবাগানের সেই বাড়ী। বাহিরের অন্ধকার নোংরা কুঠুরিগুলা পার হইয়া সে কহিল—এই সিঁড়ি, দেখতে পেয়েছ ? খুব সাবধানে ভাই, ডান দিকে দেয়াল ঘেঁষে—ইয়া।

কোনও রকমে দুইজনে উপরে উঠিল। সুবোধের গা ছম্‌ছম্‌ করিতেছিল। অপরিচিত কোনও লোকের বাড়ী তাহার এই প্রথম প্রবেশ।

আসনের বালাই নেই ভাই, মাটিতেই যা'হ'ক করে। দেখো, জল প্যাচ প্যাচ কচ্ছে, জামাটা যেন তোমার,—হাসিয়া আবার বলিল—মানুষকে সাবধান করবার মত মুদ্রাদোষ আমার নেই। তবে পরিচয়টা প্রথম কি না, তাই একটুখানি—

যা'হ'ক করিয়া সুবোধ সেইখানেই বসিল। এলোমেলো কতকগুলা বই, খবরের কাগজ সেখানে ছড়ানো। অনেকগুলি বইএর ইংরাজি হরপঃ কিন্তু ভাষা তাদের ইংরাজি নয়।

সুবোধ চাহিয়া চাহিয়া বলিল—এ-সব পড়েছেন আপনি।

শুধু পড়েছি, পড়ে জেল খেটেছি!

জেল খেটেছেন ? কেন ?

লোকটা শুধু হাসে। হেসে বলে—ইংরাজ রাজত্বে কি আর 'কেন'র উত্তর পাওয়া যায় ?

আগাগোড়া অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইতেই সুবোধ উস্‌খুস্‌ করিতে

লাগিল। এ অন্ধকারে পলাইবার কোনও উপায় নাই। পথ দেখাইয়া না দিলে সমস্ত রাত্রির চেষ্টাতেও হয় ত সে এখান হইতে বাহির হইতে পারিবে না। চীৎকার করিলেও কেলেঙ্কারী!

মুখে বলিল—খুব ত আপনি?

লোকটা আবার হাসিতে থাকে। তাহার এই নিরর্থক হাসি, এই অন্ধকার, ওই মিটমিটে আলো, চারিদিকের অবরুদ্ধ নোংরা গন্ধ,—সমস্ত মিলিয়া সুবোধকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

হঠাৎ সে কহিল—যাই এবার। দিদি আবার এর পর—

তবে এসেছিলে কেন? বৌদির প্রতি লোভটা খুব প্রবল হয়েছিল বুঝি?

উক্তিটা একেবারে লজ্জাহীন। সুবোধের কান দুইটা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে মৃদুকণ্ঠে কহিল—ঘর থেকে বেরোনো আমার অভ্যেস নেই কি না, তাই। তাছাড়া দিদি আমাকে কোন দিন—

দিদি-ময় যে! বলি, পুরুষ মানুষ ত? না কি বিধাতা ভুল করে-ছিলেন, শোধরাবার সময় পান নি—বল না হে?

এই অপমানকর প্রশ্নের আর কিই-বা উত্তর দেওয়া যায়।

বেশ একটা রোমান্সের আঁচ পেয়েছিলে—না? দুনিয়ার আড়ালে থাকি, ভবঘুরে লোক, বিধবাকে নিয়ে ঘর করি,—বেশ লাগছিল তোমার—নয়? কিন্তু তোমার দিদিই যে সব মাটি করে দিচ্ছেন; এমন রাজজোটক অবস্থাটার প্রতি তাঁকে একটু কৃপা-দৃষ্টি দিতে ব'লো —বুঝলে?

সুবোধ কহিল—আপনি জানলেন কি করে যে দিদি আপনার বিরুদ্ধে—?

সে হাসিয়া বলিল—মানুষ চেনার কাজেই এই তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম। তোমার চেয়ে তোমার দিদিকেই যে বেশি চিনি হে। ভেতর ভেতর তাঁর ক্রিয়া কলাপ—

আপনি কি তাঁকে দেখেছেন ?

দেখলে কি আর চিনতাম ? ওদের যে না দেখেই স্পষ্ট চেনা যায়। অমন অনেক দিদির কবল থেকে যে মুক্ত হয়ে এসেছি,—বলিতে বলিতে হঠাৎ ভিতরের দিকে চাহিয়া সে পুনরায় বলিল—কি বল মলিনা, আমার চেয়ে তোমার হাড়ে তাদের পরিচয়টা একটু বেশিই ঠোকাঠুকি হয়েছিল—না ?

মলিনা !

কিন্তু যাহার উদ্দেশে প্রশ্ন—সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর।

আড় হইয়া সে শুইয়া পড়িল।

বইগুলি স্মুখে পড়িয়া রহিল ; আলো জ্বলিতে লাগিল।

চোখ বুজিয়া সে ডাকিল—সুবোধ ?

সুবোধ কহিল—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে ?

এ-কথার উত্তর সে দিল না। চোখ বুজিয়াই হাসিয়া সে কহিল—তোমার দিদি আমাদের দেখতে পারে না—না ?

সুবোধ চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চন্দ্রার প্রতি সেই শ্লেষটা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল।

জড়িত কণ্ঠে লোকটি আবার কহিল—আচ্ছা সুবোধ, এমনও ত হতে পারে, এতক্ষণ তোমায় যা বলেছি সে সব আমার ভেতরের কথা নয় !

সুবোধ মনে মনে পথ হারাইয়া গেল। বিভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল—এবার আমি যাই—কেমন?

যাবে? তা যাও।—সে যেন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—ঝড়ের রাতে আমার আকাশে তোমরা এমনি করে এক একবার জ্বলে উঠেছ, আবার ঠিক এমনি করেই মিলিয়ে গেছ! এ জীবন শুধু দু'হাতে অন্ধকারই ঠেলে চলবার!

সুবোধ ততক্ষণে উঠিয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে। লোকটি অকস্মাৎ উঠিয়া বসিয়া কহিল—দিদিকে তোমার ব'ল, তাঁর ওপর আমার ভক্তি দিন দিন,—এমনি একটা কিছু ব'লো—বুঝলে?

আবার সে আড় হইয়া শুইল।

নেশাখোর!

সেই বীভৎস অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া সুবোধ নামিয়া আসিল। ইতিমধ্যে দুইবার মাথা ঠুকিয়া গেছে। কোন্ দিকে যাইবে তাহার ঠিক পাইতেছিল না। সহসা দেখিতে পাইল, উপরের পাঁচিলের পাশ দিয়া তাহার পথের প্রতি কে আলো বাড়াইয়া ধরিয়াছে।

সুবোধ কিন্তু চোখ আর নামাইতে পারিল না।

সুগোল সুন্দর একখানি নারীর হাত! চিক্‌চিকে একগাছি চুড়ি আঁটা। কিন্তু সেই অপরূপ হাতখানির অধিকারিণী আড়ালেই রহিয়া গেল। সুবোধ দুতিনবার ঢোঁক গিলিয়া ফেলিল।

তার পরই কখন্ চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া আলোটি সরিয়া গেল।

অন্ধকার······

অতি কষ্টে সুবোধ পথ দেখিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল।

পলাইয়া আসিয়াও স্বস্তি নাই। চকিত দৃষ্টি আর সাগ্রহ মন ওই-দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে,—কম্পাসের কাঁটার মত।

খানিকক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করিল। কেহ আর দেখিতে পায় না। শেষে সাহস করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ডাকিল—দাদা আছেন?

ভিতরে কোথায় কিসের শব্দ হইতেছিল। তবুও তাহার মৃদু কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া দাদা ডাকিল—এস সুবোধ!

তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া দাদার সেই ঘরের কাছে আসিয়াই চট্ করিয়া সুবোধ থমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মেয়েটি পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দাদা তাহাকে যাইতে দিবে না।

এস হে, ভেতরে এস। লজ্জা কি! একটি বৌদি মিলিয়ে দেবার কথা ছিল যে তোমার সঙ্গে।

লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সুবোধ ভিতরে গিয়া বসিল। দাদা কহিল—তোমারই নাম কচ্ছিলাম এতক্ষণ! কদিন আর দেখা নেই কেন? আমার সঙ্গে এত অল্প পরিচয় হয়েই কেউ যে আমার নেশা কাটিয়ে উঠতে পারে, এমন লোক ত আর আমার চোখে পড়ল না। যাই হোক—সেদিন, আর আসবে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলে,—আজ কি শুক্রপক্ষের উপবাসী দুখানি শুক্‌নো মুখ দেখতে এলে নাকি?—তা দেখবে ত দেখ!—বলিয়া সে পাশের সেই মেয়েটির মাথার ঘোম্‌টাটা হট্ করিয়া খুলিয়া দিল, পরে তাহার লজ্জানত সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

সুবোধ মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, মেয়েটির মুদ্রিত চক্ষু দুটির কোলে তখনও জল শুকায় নাই,—আর একদিকে দাদা তাহার আঁচল

চাপিয়া আছে। কিন্তু সে তখনকার মত কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল —আপনাদের কি এখনও খাওয়া-দাওয়া—?

আরে সেই জন্যেই ত ঝগড়া হে! বলছিলাম, দুজনের প্রেমালাপের ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া দাওয়ার কথাটা আর নাই বা তুললে, শুয়ে বসে ত দিন কেটে যাচ্ছে?—বলি, ও মলিনা বিবি,—তোমার কদিনকার উপবাসের তালিকাটি দেবরের কাছে একবার মেলে ধর না গো।

কিন্তু মলিনা বিবি আর নড়ে চড়ে না। মাথার ঘোমটাটিও আর মাথায় তুলিয়া দেয় নাই। সুবোধ অলক্ষ্যে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই নতমুখখানি বাহিয়া ঠোঁটের কাছে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিয়াছে।

হয়ত অপমানে—হয়ত-বা লজ্জায়! হয়ত-বা নিষ্ফল ঘৃণায়!

দাদা নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল। সুবোধ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল—ছি!

মেয়েটি এবার চোখ মুছিয়া মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর টানিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বাহির হইয়া গেল। সুবোধ পিছন হইতে দেখিল, সেদিন হাতে দুগাছি চুড়ি ছিল, আজ তার বদলে কাপড়ের ফালি বাঁধা!

খানিকক্ষণ পরে সুবোধ উঠিয়া নীচে নামিয়া আসিল। হঠাৎ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল—ডানদিককার ঘরটায় পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য জন্তুর মত দাদা পায়চারি করিতেছে।

আপনি, ওখানে—কি?

আগুনের ডেলার মত চোখ ফিরাইয়া দাদা চাহিল। মনে হইল তাহার ভিতরের কোথায় পুঞ্জীকৃত বিষের জ্বালা মাথায় চড়িয়াছে।

বলিল—মেয়েদের চোখের জল মানুষকে কেমন করে নষ্ট করে, জানো? বিয়ে করেছিলাম ওকে তিন-আইনে। সেদিন অসহায় বিধবার চোখের জল অস্বীকার কর্ত্তে পারলাম না। বদমাইস বাপটার অত্যাচার থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনলাম! কিন্তু মহত্ত্ব কি দেখালেই হল? সেদিনকার সেই ভুলের শাস্তি আজও—

খামখেয়ালীর গল্পের মত দাদা সেখানে দাঁড়াইয়া আপনার কাহিনী শুরু করিল।

একবার একটা ডাকাতের দল পুলিশের ভয়ে পথে ছত্রভঙ্গ হয়।

দাদা লুকাইয়া বাঙলার বাহিরে কোথায় এক পার্ব্বত্য প্রদেশে যান। অনেকদিনের কথা। গাঁয়ে এক গৃহস্থের খোঁজ পায়। ভাব-আলাপের পর নিমন্ত্রণ খাওয়া এবং বক্তৃতা দেওয়া চলে। একদিন গৃহিণী মারা পড়িলেন। বড় আদরের বিধবা মেয়েটি তখন একা। বাপটা মাতাল। দূরে কোথায় সাঁওতালি পাড়ায় গিয়া রাত কাটায়। মাঝে মাঝে মদ খাইয়া আসিয়া মেয়েটাকে প্রহার করে। বেশ উপযুক্ত অবসর!

দাদা হাসিয়া বলিল—আমার প্রতি মেয়েটির গোপন প্রেম না কি প্রথম দর্শনের পর থেকেই ফল্গুধারার মত,—তারপর একদিন দূরে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি ঝরণার পাশে বসে উনি খামকা কাঁদতে শুরু করলেন! অর্থাৎ নাটুকে কায়দায় প্রেম-নিবেদন আর কি! কি করি—বললাম, চোখের জল ফেলো না, তোমায় আমি বাঁচাতে পারি কিন্তু। ও বললে, বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি। ব্যস্—কুড়ি টাকায় দুটি বোতল ওর বাপকে কিনে দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনলাম!

তার পর?

তার পর বোষ্টমী বললে,তোমার দুটি শ্রীচরণ ছেড়ে কোথাও যাব না। তার পর থেকে যেখানেই ভেসে যাই, উনি আমার গাধাবোট!

এ ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কিছু—?

দাদা কহিল—বললাম, বোষ্টমি, এ জন্মটা তুমি বিধবা হয়েই থাক, মা হয়ে আর দরকার নেই।

সে কি?

অর্থাৎ একটি সুসন্তান হয়েছিল; কিন্তু দিলাম সেটাকে কুড়ি টাকায় ঝেড়ে, ডাক্তার বাবুদের সেই কোচোয়ানটার কাছে!

সুবোধের মুখখানা দেখিতে দেখিতে সাদা হইয়া গেল। আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল।

নিয়মের ব্যতিক্রম বৈ কি!

যেখানে ছিল অন্ধকার গুহা, সেখানে ফাটল দেখা দিল; নীল আকাশের আলো আসিয়া পড়িল। ষড়ঋতুর যেখানে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল, এখান সেখানে বাতাস চলাচল করে। জড়ের মধ্যে গতির বেগ দেখা দেয়!

চট্ করিয়া সুবোধ বাহির হইয়া যায়, আর শীঘ্র ফেরে না। রাস্তায় রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরিয়া আসে। হয়ত-বা কোনদিন পায়ে হাঁটিয়াই শহরে যায়।

সেদিন দাদার নজরে পড়িয়া গেল। বলিল—কি হে অভিমানী বালক! আর যে ওদিক মাড়াও না?

সুবোধ কহিল—কোথায় চলেছেন?

চল না—যাবে? ও কি মাথায় তোমার তালি মেরে দিলে কে?

চুল কেটেছি।—সুবোধ কহিল।

এঃ—কাঁচির দাগ হয়ে গেছে যে! দিদি কেটে দিলে বুঝি?

আপনি জান্‌লেন কি করে?

জানতে পারি বৈ কি! পুরুষের চুল সম্বন্ধে মেয়েদের ভয়ানক হিংসে! রাগ করে কেটে দিলে না কি?—কেন?

আমি না কি লোকের দেখে দেখে চুল রাখছিলাম।

দাদা হাসিয়া বলিল—আমিই বুঝি সেই লোক?

এমনি করিয়া পথ চলিতে চলিতে গল্প হয়। সে কেবল এক পক্ষের ব্যক্তিগত গল্প।

সুবোধ ভাবিল, এ পথ যেন আর ফুরায় না।

ক্রমে বেলা গেল, গাছের মাথা হইতে আলো ফুরাইল। শহরের দোকান পসারিতে আলো জলিয়া উঠিল।

শেষে দাদা দূর পথের দিকে চাহিয়া আপনাকেই যেন আপনি শুনাইতে লাগিল—কিন্তু যা দেখছ ভাই, এসব মিথ্যে। মানুষকে কোনদিন যেন বিশ্বাস কর না; ভগবানকে মানার চেয়ে একটা আদি বৈজ্ঞানিক শক্তিকে স্বীকার করো; পুণ্যকে এড়িয়ে চলো কারণ তার রং শুধু সাদা, কিন্তু পাপকে ভালবেসো,—তার মধ্যে রঙয়ের খেলা পাবে, বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলবে। যদি প্রেমে পড় তাহলে আনন্দ পাবে; কিন্তু প্রেমের ব্যর্থতা না ঘট্‌লে পরিপূর্ণ রসের অস্বাদ পাবে না। আমার বন্ধন কোনদিন স্বীকার কর না—কারণ তাই তোমার মৃত্যু।

সুবোধ স্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শোনে।

দাদা তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া হঠাৎ বলে—আচ্ছা, মলিনাকে দেখতে কি খুব ভাল নয়? কিন্তু আমি যে ওর স্বামী—এ ত আমি

সইতে পারিনে। ওকে আল্‌তা পর্‌তে দিই না, পান খেতে দিই না, তেল মাখতে দিই না,—আমার ভয়, পাছে ও ভাল দেখতে হয়। সিঁদুর পরাই না ভাই,—ওকে স্ত্রীর মত ভাবতে আমার গা কাঁপে! কিন্তু তবু ত ভাই, মলিনা ভাল! আমার দিকে যখন আনমনে চায়, ভাবি—আমি যদি কাব্য লিখতে পারতাম!

তাহার মুখের প্রতি সুবোধ খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল,—তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কোনও কথা বাহির হইল না।

দাদা আবার বলিল—একখানির বেশি কাপড়ও ভাই আমি তাকে দিই না, পাছে তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে, পাছে আর ভালও দেখতে হয়। সেই নীলাম্বরীখানি মাত্র সম্বল; তার যে কত জায়গায় ছেঁড়া,—ছেলেমানুষ তুমি, কি আর বলব। কিন্তু এর জন্যে এতটুকু অনুযোগ কোনদিন করে না!

কিছুই বলেন না?

বলে ভাই, চার পাঁচদিন উপবাসের পর আর থাকতে পারে না। ছেলেমানুষ ত হাজার হক, তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদে—এই যেমন সেদিন—

ক্রমে মলিনার সঙ্গে পরিচয় হয়। আগে দেখিলে পলাইত; এখন আর পলায় না। যে ঘরে সুবোধ বসে সে-ঘরে যাতায়াত করে। দাদা বলে—লজ্জা বটে! একেবারে গুণ চটের আবরণ,—ছিঁড়তে চায় না।

তারপর একদিন আগল খুলিয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া সুবোধ নামিয়া যাইতেছিল। মলিনা এদিক-ওদিক

তাকাইয়া চুপি চুপি বলিল—দেখুন আপনি…আপনি ওঁর সঙ্গে আর বেড়াবেন না। ভারি বিপদে পড়বেন একদিন।

ঘরে ফিরিয়া সুবোধের সেদিন চোখে জল আসিয়াছিল। অকারণে চোখে জল!

বার-বাড়ীর যে দিকটা প্রায় খালিই পড়িয়া থাকে, সেখানে সেদিন সুবোধ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

তখন সন্ধ্যা।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে চন্দ্রা আসিয়া বলিল—বসে আছিস্ এখানে? বড় বিপদ যে!

তাহার ভয়-ব্যাকুল আলুথালু অবস্থার দিকে চাহিয়া সুবোধ বলিল—কি রে?

ভানু কেমন কচ্ছে, হয়ত বাঁচবে না। শ্বাস আরম্ভ হয়েছে।

অমন হয়েছিল ত দু'তিনবার! আবার ত—

না, না—সেদিন আমার সঙ্গে ঝগড়ার পর থেকে কেমন যেন—

বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহই নাই। ইস্কুল কলেজের ছুটি ফুরাইতে ছেলেরা শহরের বাসায় চলিয়া গেছে। বড় কর্ত্তা গেছেন শিষ্যবাড়ী। মেজ গেছেন মামলার তদ্বির করিতে কলিকাতায়; ফিরিতে আরও দুএকদিন। ওদিককার বড়-বৌ আর ছোট-বৌ ছেলেমেয়ে লইয়া ভাইয়ের সঙ্গে গেছেন তীর্থ করিতে।

সুবোধ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রা শুধু মুমূর্ষু ভানুর প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কাছে গিয়া চন্দ্রা দেখিল—মুখ গুঁজিয়া মরিয়া আছে।

চন্দ্রা শুধু বলিল—এখন উপায় ?

তাই ত !

নিয়ে যাবার লোক ত কোথাও—। খবরই বা কাকে দিই ?

সুবোধ কি ভাবিয়া বলিল—যদি রাজি হস্ ত বলি ।

কি ?

দাদাকে খবর দেবো ? ওই কলাবাগানের—

সে কি রে ? এ বাড়ীর মড়া সে ছোঁবে ? এঁরা এসে বলবেন কি ; যদি জাতে ঠেলে আমাদের ?—তাছাড়া যে শত্রুতা করা হয়েছে তাদের সঙ্গে, আমাদের সাহায্যে সে আসবে কেন ?

সে রকম লোক সে নয় !

খানিক ভাবিয়া চন্দ্রা বলিল—তবে দেখ ভাই। যদি সে আসে দয়া করে'।

সুবোধ বাহির হইয়া গেল।—মড়া আগলাইয়া চন্দ্রা সেইখানে বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে মানুষের সাড়া পাইয়া চন্দ্রা নড়িয়া উঠিল। মাথায় ঘোমটা টানিয়া সে একপাশে উঠিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইল।

দাদা হেলিতে দুলিতে ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। তারপর অনুমানে চন্দ্রার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—ভায়া গেলেন ডোম পাড়ায় পালঙ্কের সন্ধানে। শুনলাম সবই—এই জড়পিণ্ডটিকে জয়যাত্রায় নিয়ে যেতে হবে ! বেশ বেশ—এটা আমার চিরদিনের অভ্যেস।

মাথা হেঁট করিয়া চন্দ্রা সবিনয়ে বলিল—আপনার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে ; কিন্তু যে উপকার আজ পেলাম—

মুখের একটা শব্দ করিয়া দাদা বলিল—মানুষ আর কি অন্যায়

কর্ব্বে আমার উপর, কতটুকু তার শক্তি ! আর উপকার ? ওটা আমি খুব পারি।

তামাসা করিবার উপযুক্ত সময় বটে !

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া দাদা কহিল—নিন, মাথার দিকটা ধরুন—আমি ধরছি পায়ের দিকটা—চ্যাং-দোলা করে বাইরে নিয়ে যাওয়া যাক্ ততক্ষণ !

চন্দ্রা সরিয়া আসিয়া শবদেহটির মাথার দিকটা তুলিয়া ধরিতেই—

আলো পড়িয়াছিল দুইজনেরই মুখে।

অকস্মাৎ চন্দ্রার দৃষ্টি পড়িল তাহার মুখের উপর।

চলুন—নিয়ে যাই ; দেরি কচ্ছেন কেন ? এর পর আবার,—

চোখ নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চন্দ্রা মৃতের মাথার দিকটা পুনরায় ধরিতেই দাদা খানিক হাসিল।

হাসিয়া কহিল—পূর্ব্ব স্মৃতির আলোড়ন—না চন্দ্রা ?

চন্দ্রা চমকিয়া উঠিল। বলিল—কাকে কি বলছেন ?

* * *

খানিক বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া দাদা বলিল—তোমাকে হঠাৎ তখন ছুঁয়ে ফেললাম—না ? না ছুঁলেই ভাল হত চন্দ্রা, এ জীবনে অনেক পাপ করেছি।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে চন্দ্রা শুধু বলিল—আপনি কবে যাবেন এ পাড়া থেকে ? কাল সকালেই না হয়—

শবদাহ শেষ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত দুইজনে শেষরাত্রে ফিরিতেছিল।

দাদা ডাকিল—সুবোধ ?

সুবোধ মুখ তুলিল।

আজ আমার জীবনের রহস্যটি তোমায় শোনাবার দিন ছিল, কিন্তু কথা বলতে পাচ্ছিনে, ভাই।

তাহলে কাল শুনবো। বলবেন ত ?

দাদা চুপ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

তার পরদিন। বেলা তখন অনেক। কলাবাগানে সেই বাড়ীর উপর তলাকার নির্জ্জন ঘরে সুবোধ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

মলিনাকে লইয়া দাদা কখন চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় তাহাকে একবার বলিয়াও যায় নাই।

পায়ের শব্দ পাইয়া মুখ তুলিতেই সুবোধ দেখিতে পাইল—চন্দ্রা !

চন্দ্রা থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তুই এখানে ? খুঁজছিলাম যে ! খবর পেলাম। এরা চলে গেছে বুঝি ? এমন ভাঙা বাড়ীতে ছিল কি করে ?

কোনও মতে সে আপনার মুখভাবকে গোপন করিতে চেষ্টা করিল।

ওকি—যাস্ কোথা ?

খুঁজতে ?

কাকে খুঁজতে ?

দাদাকে। তার শেষ কথাটা শুনতেই হবে। যেখানেই সে থাকুক —আমি তাকে,—

চন্দ্রা কহিল—যদি না পাস্ ?

না পাই, আর ফিরবো না।

তাড়াতাড়ি সে পথে নামিয়া আসিল।

রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ পথ। বৈরাগীর মত উদাসীন। কিন্তু তাহার সেই বিস্তৃত বাহুর আড়ালে এই ছেলেটি হয়ত চিরদিনের মত আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

* * *

দিনকয়েক বাদে কাহারা দাদাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল। অনেকে বলে পুলিশের লোক। কেউ কেউ বলে, গোয়েন্দা! একটা জালিয়াতি আসামী না কি এই পাঁড়ায় কোথায় আসিয়া লুকাইয়া ছিল। কেউ বলে—এ তারই কাজ।

বার বার মাথা নাড়িয়া চন্দ্রা বলিল—না, না—কিছুতেই না; আমি জানি সে—

বাসুর পিসি বলে—না বৌমা, এ সেই ঝাঁকড়া-চুলোরই কাজ।

চন্দ্রা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলে—সত্যি? তা হলে কিন্তু—এ যে ভারি, ছি ছি—

দরদী

মুখুজ্যে গলির সাত নম্বর বাড়ীটায় সব শুদ্ধ পাঁচ ঘর ভাড়াটে থাকে। গলির শেষের দিকে এক কোণে সে বাড়ীখানা, সাধারণের যাতায়াত সে গলিতে হয় না,—একদিক বন্ধ। বাড়ীখানা অতি জীর্ণ; ছেঁড়া কাঁথায় তালি মারার মত মাঝে মাঝে বালির কাজ করা। চুণকাম কবে যে কোথায় করা হইয়াছিল তার ঠিক নাই, সুতরাং অতগুলি তালির মধ্য দিয়া বাড়ীখানির কি বর্ণ তা বোঝা শক্ত। বাড়ী-

খানার সুমুখেই দুইটা আস্তাবল, তাহার ওপাশে একখানা বড় লোকের বাড়ী। এ বাড়ীখানা ছাড়া সবগুলিরই সদর দরজা রাস্তার উপর, সুতরাং তাহাদের পিছনে এই বাড়ীটার সুমুখে যত আবর্জ্জনা দিন-রাত জমা থাকে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা গিয়াছে পাশের বাড়ীর ঝি-চাকরেরা জঞ্জাল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ইহার নীচের ঘরের বিবর্ণ জান্‌লা কপাটগুলা নোংরা করিয়া রাখিয়াছে। কখনও কেহ কিছু আপত্তি করিলে তাহারা নাক সিঁটকাইয়া বলে, নরুকে পোকার তেজ দেখ—

নীচের দুপাশের ঘরগুলা রাস্তা হইতে দুহাত নীচে এবং আলো হাওয়া না পাইয়া যেমন অন্ধকার তেমনি স্যাঁত-সেঁতে। আস্তাবলের আবর্জ্জনা আর সুমুখের আঁস্তাকুড়ের দুর্গন্ধে সদা সর্ব্বদা মাছি ভন্ ভন্ করে, রাস্তার ঘেয়ো কুকুর খাবার খুঁজিতে ভিতরে চলিয়া আসে, আস্তাবলের মুরগীগুলা পাঁচিলে উড়িয়া বসে। বড় বড় ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে টেঁকা যায় না।

ডান দিকের অন্ধকার খুপ্‌রিটায় একটা লোক খঞ্জনি বাজাইয়া দিন-রাত কীর্ত্তন করে, বউটাকে অকারণ গালাগালি দেয়, প্রহার করে।

বাঁ দিকের ঘরটায় পাল্কীর বেহারা জগবন্ধু ও তার ভাই থাকে। তারা রাত্রিতে বাড়ী আসে, সকাল না হইতেই চলিয়া যায়। ঘরে তালা বন্ধ থাকে আর মাটির উনুনটা কালিঝুলি মাখিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে।

দোতলার পিছন দিকে অবিনাশবাবুরা থাকেন। তিনি আপিসের কেরাণী, দশটা ছয়টায় কাজ। কষ্টে সংসার চলে। বউ ভামিনী বাপের বাড়ী হইতে ম্যালেরিয়া আনিয়াছে, আজকাল কালাজ্বরে দাঁড়াইয়াছে। সংসার দেখিবার মত লোক ঐ এক ছোট বোন সুলক্ষণা। ছোট বলিয়া সে ছোট নয়, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামী রমণী

অপদার্থ, চাকরী বাকরির ঠিক নেই, রোজগার কখনও করে, কখনও করে না। কোথায় একটা বাসায় থাকে, মাঝে মাঝে আসে। সুলক্ষণাকে লইয়া যাইবার নামও করে না, থাকিবার খরচা একটি আধলাও দেয় না। অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট বশতঃ যদি সুলক্ষণা কখনও কিছু চায় সে বলে, মাস কাবারে দোবো। বলিয়া চলিয়া যায়, আর সহজে আসে না।

অবিনাশবাবুর উপরের ছোট্ট দালানের মাঝামাঝি একটা কঞ্চির বেড়া। মাঝে ক্ষুদ্র একটি দরজা। ওধারে ধনুবাবু ও তাঁর ভাই অতুল থাকে। ধনুবাবু হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, অর্থাৎ এক বাক্স ঔষধ ও একখানি বই তাঁহার নিজস্ব আছে। সময়েঅসময়ে তিনি লোককে ঔষধ বিতরণ করেন। তাঁর ঔষধে রোগ ভাল না হইলে তিনি বলেন শিবের অসাধ্য। ভাল হইলে বলেন, আমি জানি আমার এক ফোঁটা ওষুধ কারো পেটে পড়লে যমও ফিরে যায়—হুঁঃ!

ধনুবাবু দিনের বেলায় স্কুলের মাষ্টারী করেন, বিকালে বাড়ী ফেরেন। তিনি বিয়ে করেন নি। তাঁর ছোট ভাই অতুলের বয়স অল্প, একটা পাশ করিয়াছে। এখন খবরের কাগজ পড়ে, গান গায়, আর জান্‌লার ধারে বসিয়া কবিতা লেখে, অর্থাৎ বেকার। ধনুবাবু রোজই বলেন, পনের কুড়ি টাকার একটা যা তা চাকরী জোটাতে পাল্লিনে?

উত্তরে অতুল কিছু বলে না, শুধু চুপ করিয়া হাসে। একদিন সে কবিতা লিখিতে লিখিতে মুখ তুলিয়া দাদাকে বলিল, কই আর পাচ্ছি দাদা!

—কিন্তু

—কিন্তু কি? তুমি বুঝি খেতে দিতে পাচ্ছ না?

ধনুবাবু ঠাস্ করিয়া তার গালে এক চড় মারিয়া বলিলেন, তার জন্যে কি বলচি হতভাগা ? চাকরী হ'লে তোর একটি বিয়ে দিয়ে যে চলে যাই—

অতুল হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ, তাই জন্যে, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে ?

ধনুবাবু মাথা চুলকাইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, তাই ত যাবই বা কোথায়, কিন্তু—

এমনি ভাবে তাহাদের দিন যায়।

দোতলার সুমুখ দিকে বাড়ীওয়ালা ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হরিপ্রিয়া থাকেন। দ্বিতীয়পক্ষ-সুলভ সব গুণগুলিই হরিপ্রিয়াতে বর্ত্তমান। তাঁহার সন্তানাদিও কিছু হয় নাই। নীচে যে বোষ্টমটি থাকে তার নাম প্রেমানন্দ! তার গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক, মাথায় টিকি এবং চক্ষে মাদকতা প্রভৃতি সব লক্ষণগুলিই আছে। খোঁচা-খোঁচা দাড়ী এবং মাথায় কয়েক গাছা চুল পাকিয়া গিয়াছে। দু'মাসের ভাড়া তাহার নিকট পাওয়া যায় নাই। তাই সেদিন সকাল বেলা হরিপ্রিয়া বোষ্টমটিকে গালাগালি দিয়া সমস্ত বাড়ীখানা মাথায় করিয়া তুলিতেছিল।

বিনয়বাবু তখন বিছানা হইতে উঠিয়া বাসিমুখেই চা খাইতেছিলেন, সহসা স্ত্রীর কাঁসার ন্যায় কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলেন।

তাহার চীৎকারে ওধারে অতুল বাহিরে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া ইঙ্গিতে বলিল, কি হ'ল বিনয়বাবু ?

বিনয়বাবু চায়ের বাটী শেষ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পীড়ন করিয়া বলিলেন "ভাড়া,—ভাড়া দেয় না ওই বোষ্টমটা তাই

উঠিয়ে দিতে হবে। তোমার দাদার কাছেও এ মাসের ভাড়া—দাঁড়াও আসচি”,—বলিতে বলিতে চায়ের বাটীটা রাখিয়া তাড়াতাড়ি কি কাজে চলিয়া গেলেন।

অতুল দাঁড়াইয়া রহিল। নীচের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, সকাল বেলাতেও সূর্য্যের আলোক সেখানে প্রবেশ করিতে পায় নাই। উঠানে সমস্ত বাড়ীটার আবর্জ্জনা জমা হইয়া রহিয়াছে, কেহ পরিষ্কার করিবার নামও করে না, ফিরিয়াও তাকায় না। নীচে যে ঘরটায় বোষ্টমটা থাকে সেটার দুয়ার খোলা এবং তাহারই নিকট হইতে মৃদু মৃদু কড়া মাজার শব্দ আসিতেছে। অতুল এ দিকে বড় একটা তাকায় না, সে উপরে আপন ঘরটাতেই সদা সর্ব্বদা বসিয়া থাকে এবং বাহিরে যাইবার সময়ও কোনও দিকে খেয়াল না করিয়া চলিয়া যায়। আজ দেখিল সেখানে পাশাপাশি আরও দুই তিনটা ঘর খালি পড়িয়া রহিয়াছে এবং বাড়ীর বাহিরে ‘ঘড় ভাড়া’ লেখা সত্বেও কেন যে সে ঘর কয়খানার ভাড়া অদ্যাপি হয় নাই তাহা আজ এই ঘরগুলার অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিল,—এমান অন্ধকার এবং অব্যবহার্য্য। দেখিয়া তাহার নিজেরই দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

এতক্ষণ যেখানে কড়া মাজার শব্দ হইতেছিল সেখান হইতে একটি মেয়ে কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটা ভাঙ্গা চেঙ্গারি ও একখানা টিনের টুক্‌রা লইয়া বাহির হইয়া আসিল। সে অতুলকে দেখিতে পায় নাই সুতরাং আপন মনে টিনের পাতাখানা দিয়া উঠানের সমস্ত জঞ্জাল জড়ো করিতে লাগিল। অতুল আর স্থির থাকিতে পারিল না, বলিল, ওকি ছি ছি আপনি ওতে হাত দেবেন না, ও মেথরে পরিষ্কার করবে।

মেয়েটি তাহাকে দেখিয়াই দ্রুতপদে অন্তরালে চলিয়া গেল। একটু

পরে পুনরায় সে বাহিরে আসিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, আর কেউ নয়—বলিয়া সে আবার জঞ্জাল তুলিবার উপক্রম করিল।

অতুল বলিল, না না আপনি হাত দেবেন না, হাত নোংরা হয়ে যাবে—

করুণ হাসি হাসিয়া মেয়েটি বলিল, আপনারা ওপরে থাকেন কিন্তু দুর্গন্ধ ত আমায় সইতে হয়!

তা বলে মেথরের কাজ কি আপনার করা উচিত?

কি করি বলুন, মেথরের মতন আছি যখন, তখন—বলিয়া সে আবার একটু হাসিয়া কাজে মন দিল।

অতুল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার স্বামী কোথায়? দুদিন আসেন নি, তাই বিনয়বাবু, না—না, তাঁর স্ত্রী রাগ কচ্ছিলেন। তিনি কোথায়?

মেয়েটি ম্লানমুখ তুলিয়া বলিল, তা ত জানি না, আমায় ত বলে যান না।

অতুল কি উত্তর দিতেছিল, পিছনে বেড়ার পাশ হইতে অবিনাশ-বাবু বলিলেন, ওহে অতুল!

—আজ্ঞে, বলিয়া অতুল মুখ ফিরাইল।

—নীচে ওদের সঙ্গে অত কথা কয়ো না ভাই, লোকে নিন্দে করবে।

অতুল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আমি কিছু বলি নি ত?

সে আমি জানি তুমি কিছু বলনি কিন্তু কথাবার্ত্তা বেশী কয়ো না ভাই, ওর স্বামী লোকটি সুবিধের নয়। আমরা যেমন আছি থাকি, ওরা যেমন আছে থাক্—ফুরিয়ে গেল। সংসারে কে কার অত খোঁজ

নেয়? বলিয়া অবিনাশবাবু বাজারের ছোট থলেটি লইয়া রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ভামিনীর ঘরে তখনও বাসি পাট হয় নাই। একা সুলক্ষণা সব-দিক সামলাইতে পারে না। দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি, কাগজের ছাই, ন্যাকড়ার টুক্‌রা, সাবুর ফোঁটা ইত্যাদিতে ঘরের মেঝেটা পরিপূর্ণ। পা বাড়াইবার জো নাই। জান্‌লাগুলা কাল রাত হইতে বন্ধ থাকায় এবং জ্বরো রোগীর নিশ্বাসে ঘরখানা যেমন দুর্গন্ধময় তেমনি অন্ধকার। অবিনাশ তাড়াতাড়ি জান্‌লাগুলা খুলিয়া দিলেন ও নরক-সদৃশ্য মেঝের আবর্জ্জনাগুলা তুলিয়া সেই জানালা দিয়া ফেলিয়া দিয়া হাত ধুইয়া আসিলেন। ভামিনী তখন কাঁথা মুড়ি দিয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া-ছিল। অবিনাশ ডাকিলেন সাঁড়া পাইলেন না। আবার ডাকিলেন, তখন ভামিনী মুখের কাপড়টা একটু সরাইয়া চোখ খুলিল। জ্বরে জ্বরে তাহার মুখখানা কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে, মাথায় চুল নাই, যে কগাছি আছে তাহাও কালাজ্বরে কোঁকৃড়াইয়া বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। চোখ দুইটা কোলের ভিতর বসিয়া গিয়াছে, মুখখানা রোগা হইয়া গালের উপরকার দুইটা হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

কাঁথাখানা সে গায়ের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া একটা তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল উঃ, বাবারে কি গরম, একটু জল দাও ত?

অবিনাশ জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন। দু'ঢোক খাইয়া সে বলিল, আপিস যাবে না?

যাব, তুমি কেমন আছ?

ভামিনী কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কথা আট্‌কাইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ সেই জীর্ণ রক্তহীন দৃষ্টি হইতে জল বাহির হইয়া আসিল।

চোখ মুছিবার শক্তি নাই, তাই বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া সে বলিল, যাও আপিস যাও, পরের চাকরী।

অবিনাশ তাহার এ অভিমান বুঝিলেন, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার মত কোনও কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, তাই বলিলেন, অসুখ আর কার না হয় ভামিনী! কিন্তু ওষুধ কিন্‌তে হলেও ত পয়সার দরকার? সেই পয়সার জন্যেই আমায় বেরোতে হবে ত। বলিয়া স্ত্রীর মাথায় একবার হাতটা দিয়া দেখিলেন, জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে। আজ ক'দিন হইল এই জ্বর সামান রহিয়াছে। ডাক্তারকে বলা হইয়াছিল, তিনি ঔষধের ফর্দ্দ দিয়াছেন কিন্তু পয়সা নাই। তাই আপাততঃ ধন্বুবাবুর চিকিৎসাই চলিতেছিল।

(২)

সেই দিন অপরাহ্ণে প্রেমানন্দ ফিরিল, ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, আলো জ্বালিস নি কেন? অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না যে।

সত্যি, কিছুই দেখা যায় না, তার উপর প্রেমানন্দের একটি চক্ষু আবার গেল বছর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে অনেক কথা। তখন সে নবদ্বীপে থাকে। তারপর থেকে অনেক দুষ্ট ছেলে আজও তাহাকে দেখিলেই বলে, ওগো কানা গোঁসাই, তোমার রাধা কই,—। উত্তর না পাইয়া আবার সে ডাকিল, সুমতি কোথা গেলি?

রান্নাঘরের পিছনে সেই নোংরা জায়গাটায় বসিয়া এতক্ষণ সুমতি ঘুঁটে এবং কয়লার অভাবে কাঠ কাটিতেছিল। কিন্তু অত্যন্ত অন্ধকার হওয়ায় হাতের দা'য়ের একটা কোপ কাঠে না পড়িয়া তাহার একটা আঙ্গুলের উপর লাগিয়া গিয়াছিল ও সঙ্গে সঙ্গে এমনি ফিন্‌কি দিয়া রক্ত

পড়িতেছিল যে প্রথম ডাকে অসহ্য যন্ত্রণায় সে সাড়া দিতে পারে নাই, কান্নায় গলা বুজিয়া গিয়াছিল। এইবার আস্তে আস্তে বলিল, যাই।

একটা কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া প্রেমানন্দ বলিল, গলায় মধু মাখিয়ে বল্লেন যাই, আলোটা জ্বালে কে হতভাগা মাগী? আচ্ছা এক নচ্ছার ছুঁড়ী জোটানো হয়েছে—দেখ্ মার না দিলে দোরস্ত থাকে না—বলিতে বলিতে সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া অবেলায় ভাঙ্গা হাটের কতকগুলা আনাজ তরকারী নামাইয়া রাখিল।

সুমতি সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, আজ ভাড়ার কথা কিছু বলেছিল?

হ্যাঁ ওঁরা বকছিলেন।

তাত জানি, তুই আমার ঘাড়ে না চাপলে কি আজ আমার এ দুর্দ্দশা হত? রান্না হয়েছিল?

না, চাল ছিল না তাই—

আবার তেমনি মুখভঙ্গি করিয়া প্রেমানন্দ বলিল, চাল ছিল না—থাকে না কেন? আমি ত দু'দিন বাড়ী নেই। বাইরে চাল বেচে আসিস্ কিনা সত্যি বল্, তোর ওপর আমার আরও একদিন সন্দ' হ'য়েছিল। বাইরে কারো সঙ্গে, কি ওপরকার ওই অত্‌লোটার সঙ্গে বুঝি তোর—

কথা শেষ হইল না। সুমতি যেমন আসিয়াছিল তেমনি ভাবেই চলিয়া গেল, যাইবার সময় দালানের ঘুলঘুলি হইতে দেশ্‌লাইটা ঠক্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া গেল।

শীতের দিন। অল্প বেলাটুকুর মধ্যে সকলেই কুয়া হইতে জল তুলিয়া আপন আপন কাজ সারিয়া খাবার জল লইয়া উপরে চলিয়া যায়।

সুতরাং সন্ধ্যার সময়েই সুমতি হাত পা নাড়িতে পায়। তখন ঘর ধোয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি করে। আর সেই এক ভোর বেলা, তখন কাকও ডাকে না; বিছানা হইতে উঠিয়া শীতে হি হি করিতে করিতে গায়ে সেই অনেকদিনকার ছেঁড়া কাপড়টুকু জড়াইয়া তাহাকে কাজ সারিয়া লইতে হয়। কোনও দিন ইহার ব্যতিক্রম হইলেই প্রেমানন্দের মোটা কঞ্চিটি অন্ততঃ বার দশেক তার পিঠে পড়ে। আজও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিসর পোড়ো বাড়ীর তলাটিতে যমপুরীর মত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিতে লাগিল। তা হউক, যাহারা নরকে বাস করে তাদের আর আলোর প্রয়োজন কি! সুমতি তাড়াতাড়ি বাসন কয়খানা মাজিতে বসিয়া গেল। নোংরা জায়গার বড় বড় মশাগুলা গায়ে পিঠে বসিয়া কামড়াইতে লাগিল, তাহাতে হুঁস রহিল না, কেবল বাঁ হাতের আঙ্গুলটার অসহ্য যন্ত্রণায় অথবা আরও কোনও কারণে চোখের কোণ দিয়া অবাধ্য তপ্ত অশ্রু গাল বহিয়া কেবল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

পরদিন সকালেই হরিপ্রিয়া কতকগুলি বাসন লইয়া নামিতে নামিতে বলিল, ওগো, ও গোঁসাই?

প্রেমানন্দ তখন উচ্চ বিকট স্বরে কীর্ত্তন ধরিয়াছিল, "মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে"—সহসা পরিচিত স্বর শুনিয়া বলিল, আজ্ঞে করুন—বলিয়া বাহিরে আসিল।

হরিপ্রিয়া মাটীতে বাসন নামাইয়া বলিল, গান কচ্ছ ত খুব, সকাল থেকেই শুন্‌চি, কিন্তু ভাড়াটা না দিলে চলে কি করে?

প্রেমানন্দ তাহার প্রেমাশ্রু মুছিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, মা আমি তব দাস—ভাড়ার কথা বল্‌লে আপনার অপমান হয়, বলুন প্রণামি।

আচ্ছা তাই না হয় হল' কিন্তু—

আপনার পদে এই মিনতি মা, আর তিনটি দিন আমায় ভিক্ষে দেওয়া হ'ক, আমার সংসারে বড় দুরবস্থা, খেতে পাইনি মা,—আর তিনটি দিন সবুর করুন, এই আপনার শ্রীপদে পড়ে বলচি—বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া আসিল।

হরিপ্রিয়া হাঁ হাঁ করিয়া বলিল,—থাক্ থাক্, ও কথা বলতে নেই আপনি বোষ্টম, পেন্নাম হই, কি জানেন, বাবু ও সব ভাল বাসেন না, তাই বলা। হরিপ্রিয়া এই সামান্য কথাটিতেই জল হইয়া গিয়াছিল।

প্রেমানন্দ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, বাবু ত আপনিই দেবী, আপনার শ্রীঅঙ্গে বাবু যে মিশে আছেন, শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণময়, বলিতে বলিতে সে গান ধরিয়া দিল, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু"—

আচ্ছা থাক, আমি বল্‌ব বাবুকে—

উপরে অতুল এই অভিনয় দেখিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল।

তাই বল মা আমার, আমরা তোমার দাসদাসী। বলিয়া প্রেমানন্দ ঘরে ঢুকিয়া আবার গান ধরিল, "মরিলে তুলিয়ে রেখো—"।

বারান্দার ধার হইতে সরিয়া গিয়া বেড়ার দরজা ঠেলিয়া এধারে আসিয়া অতুল বলিল, দিদি মজা দেখলে ?

সুলক্ষণা বলিল, কি ভাই ? অতুল সুলক্ষণাকে দিদি বলিত।

ওই গোঁসাই কেমন গিন্নী বউকে ভুলিয়ে দিলে।

হ্যাঁ শুনেছি, লোকটা বড় পাজী। বলিয়া আরও কিছু বলিতে গিয়া সহসা চুপ করিয়া সে অতুলের মুখের দিকে চাহিল।

অতুল কিছু বুঝিল না, বলিল, কেমন, বেশ মজা করলে ত ?

—হুঁ।

ওর বউটি কিন্তু খুব শান্ত দিদি, খুব ভাল।

তুমি কি করে জান্‌লে ?

আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে যে।

মুখ তুলিয়া সুলক্ষণা বলিল, তোমার সঙ্গে ? তুমি ওর সঙ্গে কথা কও ?

অতুল হাসিয়া বলিল, কেন ও কি মানুষ নয় ?

আমি কিন্তু কথা কই না ভাই।

অতুল মুখ ফিরাইল। নীচের কাঠের ধোঁয়ায় তখন এ দিকটা আঁধার হইয়া গিয়াছে। কি একটা কথা বলিবার সে চেষ্টা করিতেছিল।

সুলক্ষণা বলিল, ও লোকটা ওর স্বামী নয়, ওদের বিয়েও হয়নি' দু'জনে দেশ ছেড়ে এখানে চলে এসেছে।

অতুল মনে মনে চমকিয়া উঠিল এবং নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিয়া এই লজ্জাকর প্রসঙ্গটা দিদির কাছে চাপা দিবার জন্য বলিল, বড়দা এখনও কাজে বেরোন নি ?

না, তিনি বাজারে গেছেন।

ওঃ, বলিয়া অতুল আর দাঁড়াইল না, এধারে চলিয়া আসিল।

ধনু বাবু তখন একটা হোমিওপ্যাথির বই লইয়া পাতা উল্টাইতে ছিলেন, ভাইকে দেখিয়া বলিলেন, কাল সে চাকরীটার সন্ধানে গিছলি ?

হ্যাঁ।

কি হল ?

নেবেনা বললে। বলিয়া অতুল লম্বা হইয়া দাদার পিঠের কাছে শুইয়া পড়িল।

ধনুবাবু খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, ব্যবসা করবি ?

করব।

কিন্তু কিসের ব্যবসা করা যায় ?

কেন শুঁটকী মাছের ? আজকাল বাজারে খুব চলন দাদা—বলিয়া হো হো করিয়া অতুল হাসিয়া উঠিল। ধনুবাবু ভাইয়ের দুষ্টামীর জ্বালায় আর সেখানে বসিলেন না, রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। তিনি নিজেই রাঁধেন। অতুল বিমর্ষভাবে শুইয়া শুইয়া সুমতির কথা ভাবিতে লাগিল।

(৩)

শনিবার। সকাল সকাল আফিস হইতে ফিরিয়াই অবিনাশ বলিলেন, তোর বৌদি কেমন আছে রে ?

সুলক্ষণা বলিল, ভাল নেই।

সে কি কাল্‌কে ত—

আজ আর কোনও কথা কইতে পাচ্ছে না, চোখ দিয়ে জল পড়চে আর অঘোরে শুয়ে আছে।

তাই ত, পয়সাও নেই যে ডাক্তার আনি, দেখি। বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিলেন। ঘরে আসিয়া ভামিনীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ডাক্তার না দেখাইলে সারা জীবনের মত একটা দুঃখ থাকিয়া যাইবে, অথচ উপস্থিত যে কি করা উচিত তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অস্ফুটকণ্ঠে ডাকিলেন, সুলি ?

সুলক্ষণা আসিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িতেই তিনি বলিলেন, রমণী কিছু দিতে পারবে না ?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুলক্ষণা বলিল, তা আমি কি করে জানব।

কিসে কি হইল ! অবিনাশ বুঝিলেন, ভগিনী বুঝি তাঁহারই উপর

বিরক্ত হইল। চট্ করিয়া তাঁহার মাথায় ভূত চাপিয়া গেল, চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, না জান্‌লে চলে কি করে! একটা পয়সা ত কখনও দেয় না, এত দিন রইচিস্ তার খরচও দেয় না, আমার কাছে ক'টা টাকা ধার নিয়েছিল তাও ত উপুড়-হস্ত করে না। কোন্ সাহসে তুই তার হ'য়ে ওকালতি করিস্? লজ্জা করে না?

সুলক্ষণাও জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তোমারও লজ্জা করে না তার কাছে আমার খরচ চাইতে? আমি যেমন খাচ্ছি পরছি তেমনি তোমার সংসারে খেটেও দিচ্ছি, একটা ঝি রাখলেও ত তার খরচ—।

অবিনাশ তেমনি ভাবেই বলিয়া ফেলিলেন, এ অবস্থায় আমার ঝি রাখবার কথা নয়।

সুলক্ষণার চোখে জল আসিয়াছিল, কিন্তু শেষের কথাটা শুনিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ? বলিয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল এবং কি করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অতুল ঘরের মধ্যে বসিয়া ইহাদের দু' একটা কথা শুনিতে পাইয়াছিল, তাই আস্তে আস্তে বেড়ার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া যখন দেখিল সুলক্ষণা কাঁদিতেছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া বলিল, কি হ'ল দিদি?

দিদি উত্তর দিল না। অতুল দেওয়ালের দিকে ফিরাইল। ঘরের ভিতর কিছু কোথাও নাই। শুধু একধারে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও একটা পুরাতন বালিস। দু'ধারে দু তিনটা মেটে হাঁড়ি—মুখ খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতেও কিছু নাই,—শূন্য। সেই দিকে চাহিয়া অতুল বলিল, কেঁদো না দিদি?

স্থলক্ষণা আপন কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া বল্লিল, আমার কেউ নেই ভাই—

নিঃশব্দ ভগ্নপুরী খাঁ-খাঁ করিতেছে। বারান্দার পাঁচিলটার উপর বসিয়া একটা কাক অনুনাসিক স্বরে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছিল। ওধারে বিনয়বাবুর দিকটা একেবারে নীরব, বোধ হয় তাহারা ঘুমাইতেছিল। নীচেও তাই, প্রেমানন্দ বাড়ী নাই, থাকিলে গান গাহিত। অতুল একবার ভাবিল, মনের মধ্যে তার সংসারের স্থখদুঃখের রেখাটি পর্য্যন্ত পড়ে নাই, তাই সে চট করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি ত আছি দিদি, আমিও ত তোমার ভাই ?

স্থলক্ষণা ত্রস্তে মুখ তুলিল এবং আজ নূতন করিয়া যেন সে অতুলকে দেখিল। ওই স্মিত সুন্দর মুখখানির সঙ্গে আজ যেন তাহারও অজ্ঞাতে একটা নিগূঢ় পরিচয় হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা প্রকাণ্ড হতাশায় সে বলিয়া উঠিল, তুমি কি উপায় করবে অতুল ?

তা জানিনে, আমি শুধু জানি তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ভাই! কেঁদো না তুমি, রমণীবাবুর ঠিকানা কি বল ?

তা ত আমায় বলে নি।

আচ্ছা আমি খোঁজ কচ্ছি, বলিয়া অতুল বাহির হইয়া গেল।

বিকাল বেলায় অচেনা অনেক রাস্তায় ঘুরিয়া অতুল শ্রান্ত হইয়া পড়িল, রমণীর বাসা খুঁজিয়া পাইল না। তখন ভাবিল, এরূপভাবে আসা উচিত হয় নাই, অন্ততঃ অবিনাশবাবুর নিকট হইতে ঠিকানাটি লইয়া আসা উচিত ছিল, তাই সাত পাঁচ ভাবিয়া সে পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। দুয়ারে ঢুকিয়া এই অন্ধপুরীতে

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া পা বাড়াইতে হয়। নীচে ওধারে পাল্কীর বেহারা জগবন্ধুর ঘরের দরজায় ফাঁক দিয়া অল্প একটুখানি আলো দেখা যাইতেছিল কিন্তু পথ চিনিয়া লইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। যাহা হউক এমনি ভাবে আসিয়া আন্দাজে একটা সিঁড়ির উপর পা দিবে এমন সময় পিছনে কে বলিল, শুনুন—

অতুল থমকিয়া ফিরিয়া দেখিতেই সুমতি মিটমিটে কেরোসিনের ডিবেটা হাতে করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল, আসুন না, আজ উনি বাড়ী নেই—

অতুল থমকিয়া দাঁড়াইল। তখন সেদিকে কেহ ছিল না, মানুষের সাড়া শব্দটি নাই। নোংরা ইঁট বারকরা উঠানটার ফাঁকে ফাঁকে অবিশ্রান্ত ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছিল এবং জগবন্ধু নিজের ঘরের ভিতর তাহার হাবা ভাইটাকে অকথ্য এবং অবোধ্য ভাষায় তিরস্কার করিতেছিল, তাহাই শুধু অস্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। উপরে সকলেই নীরব; শীতকালের সন্ধ্যা বলিয়া সকলেই আপন আপন ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। অতুল নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, কি বলুন। বলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মনে মনে তলাইয়া বিবেচনা করিল, রূপেরও সীমা আছে কিন্তু এ মেয়েটি বোধ হয় সে সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এ রূপের তুলনা নাই।

সুমতি বলিল, আমার সঙ্গে ত আপনার আলাপ হয়েছে সেদিন!

হুঁ। আপনার স্বামী কোথায়?

তিনি নেই। বলিয়া অত্যন্ত বিবর্ণ মুখে এবং অকপটে সুমতি পুনরায় বলিল, তিনি ত আমার স্বামী নন্, আমায় তিনি—

ওঃ হ্যাঁ, এইবার আপনি ঘরে যান, আমি যাই—

একটুও দাঁড়াবেন না, আমি এতই অপরাধী? বলিয়া সে মুখ তুলিতেই অতুল দেখিল, জলে তাহার বড় বড় চোখ দুটি পুরিয়া আলোয় চক্ চক্ করিতেছে, এইবার ঝরিয়া পড়িবে। অতুল মুখ ফিরাইল। মৃদু আলোকের রশ্মিটা এই জমাট অন্ধকার অল্পমাত্র ভেদ করিতে পারিয়াছে। উপরে নীচে সম্মুখে দূরে কিছুই দেখা যায় না। পাশের আস্তাবল হইতে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ও কোরাণের অবোধ্য বাক্যগুলি কেবল শুনা যাইতেছিল। চোখের ওই দু'ফোঁটা জল যেন অতুলকে কিছুক্ষণের জন্য অবশ করিয়া ফেলিল। সে মুখ ফিরাইতে সুমতি ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনরায় বলিল, আমি কি এতই অপরাধী অতুলবাবু?

তাহার পরিষ্কার মুখখানিতে ধীরে ধীরে যে লাল আভাটুকু পড়িতেছিল তাহা অতুল বুঝিতে পারিল না, বলিল, আপনার বিয়ে হয় নি?

না।

ওর সঙ্গে বুঝি আপনার ভাব ছিল?

না, আমাদের বাড়ীতে ও লোকটা ভিক্ষে করতে আসত। তারপর একদিন নবদ্বীপের বড় কের্ত্তন শোনাবে বলে নিয়ে একেবারে চলে আসে—

অতুল আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বলিল, আচ্ছা কাল আবার আপনার সঙ্গে কথা কইব। বলিয়া পা বাড়াইতেই বিনয়বাবু উপরের বারান্দা হইতে বলিলেন, বেড়ে জমেছিল ভায়া, আর একটু চলুক না?

কথাটা এমনি বিশ্রীভাবে পরদিন প্রকাশ হইয়া পড়িল যে অতুলের মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ হরিপ্রিয়া, বিনয়বাবু ও

অবিনাশের মনে অতুলের বিরুদ্ধে একটা লজ্জাকর মন্তব্য দৃঢ়রূপে ভিত্তি স্থাপন করিল। ধনুবাবু শুনিয়া বলিলেন, পাগল কোথাকার!

অতুল উত্তর দিতে পারিল না, বিশ্বাস না করিবারও হেতু নাই এবং প্রেমানন্দ বাড়ী ফিরিলে যে একটা হৈ চৈ ব্যাপার বাধিয়া যাইবে তাহাও সে মনে মনে বুঝিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

(৪)

ইহার একদিন পরে কাপড় চোপড় গুছাইয়া লইয়া সুলক্ষণা অবিনাশের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, দাদা আসি তবে—

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাচ্ছিস তুই!

সুলক্ষণা বলিল, যাঁর হাতে আমায় দিয়েছ তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছি।

রমণী কোথায়?

বাইরে, বলিয়া পরস্পর একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর সুলক্ষণা বলিল, আসি তবে দাদা?

আয় ভাই।

সুলক্ষণা দুয়ারের বাহির হইতেই অবিনাশ মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিছু মনে করিস্‌নে দিদি, অসময়ের দিনে তোকে অনেক কথাই বলেছি, বলিয়া তিনি বসিয়াই রহিলেন। মুখ ঢাকিয়া সুলক্ষণা বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীর কাছে অতুল দাঁড়াইয়া ছিল। সুলক্ষণা তাড়াতাড়ি আপনার পুঁটুলিটি খুলিয়া একখানি ফুলকাটা রঙ্গীন তোয়ালে বাহির করিয়া বলিল, ভাই সংসারে আমার আর কিছু নেই যে তোমায় দি'; এইখানি নাও ভাই, এই দেখে তোমার দিদিকে মনে ক'র।

এতক্ষণে অতুলের চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। অন্য সময় হইলে

সে মুছিয়া ফেলিত, কিন্তু আজ মুছিল না, মুখ দিয়া তাহার কথাও বাহির হইল না। শুধু হাত পাতিয়া সেখানি লইল এবং সমবয়সী হইলেও হেঁট হইয়া সে সুলক্ষণার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। তারপর দীনহীনের মত যখন সুলক্ষণা গিয়া গাড়ীতে উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে রমণীও উঠিল, তখন আর অতুল আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আমার পয়সা থাকলে তোমায় রাজরাণী ক'রে রাখতুম দিদি, তোমায় কখনো—আর বলিতে পারিল না। সুলক্ষণা হাসিতে গেল, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বিনয়বাবু ঢুকিতেছিলেন, অতুলকে দেখিয়া বেশ মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিলেন, তোয়ালেখানি দিদি দিয়ে গেল বুঝি? তা ভাল, ওখানি বোষ্টম গিন্নীকে দিও, বেশ হবে। বলিয়া হি হি করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ইহার দিন আষ্টেক পরেও প্রেমানন্দ বাড়ী ফিরিল না, বোধ করি আবার কোনও লক্ষ্যে ঘুরিতেছিল। হরিপ্রিয়া ক্রমে অস্থির হইয়া এইবার ভাড়ার টাকার জন্য সুমতিকে শুনাইয়া গালাগালি পাড়িতে লাগিল। সুমতি কিন্তু এসব গোলমালের উত্তর ত দিলই না, পরন্তু তাহার আকারে প্রকারেও কোনও ভাবের বৈলক্ষণ্য কিছু দেখা গেল না।

সেদিন দুপুর বেলা অতুল বাহির হইতেছিল, বোধ করি চাকরীর সন্ধানেই যাইতেছিল। সে এ বাড়ীর কাহারও সহিত আর বিশেষ কথা কয় না এবং সকলে তার বিপক্ষে যে মতামত পোষণ করিয়া রাখিয়াছে বোধ করি তাহাও খণ্ডাইবার মত সাহস তাহার ছিল না। বয়স অল্প, সুতরাং তাহার গাম্ভীর্য্য নাই, কেহ কিছু বলিলে চোরের মতই সে আপনার ঘরটিতে বসিয়া থাকে।

দরজার নিকট আসিতেই সুমতি মুখ বাড়াইয়া বলিল, আপনিও আমায় ঘেন্না করেন ?

অতুল মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সে দৃষ্টি কি করুণ, কি ব্যথায় ভরা। ম্লান হাসিটুকু যা ওই সুন্দর মুখখানিতে লাগিয়া আছে তাহা যেন কান্নার চেয়েও নিদারুণ! অতুল একবার চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া বলিল, না তার জন্যে নয়, বিনয় বাবুরা কি সব মনে করেন তাই—

সুমতি বলিল, বিনয়বাবু এখন বেরিয়ে গেছেন, তা ছাড়া মিথ্যে বদনাম সইবার ক্ষমতা কি আপনার নেই ?

অতুল আবার মুখ তুলিয়া সেই দৃঢ় কোমল মুখখানির প্রতি চাহিল। এই কলঙ্কিত নারীটি সেদিন এমন একটা ভীষণ বদনাম নিজের নামে শুনিতে পাইয়াও একটু মাত্র টলে নাই, আজ আবার সেই ভঙ্গিতেই কি যেন একটা কথা বলিতে গিয়া আপনাকে সংযত করিয়াছিল। অতুল বলিল, বদনামের কাজ ত কিছুই হয়নি আমাদের। বলিতে বলিতেই সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল সুমতির কোমল চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিয়াছে। আজ দিনের বেলাতেও সে দেখিল, ইহার পরণে সেই একখানি শতছিন্ন ময়লা কাপড় কোনও রূপে দেহটাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। শীতকালে গায়ে তেল না পড়িয়া হাত পা মুখ ও মাথার চুলগুলা একেবারে রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাই নীচের অন্ধকার পুরীতে হাওয়া রৌদ্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া এই মেয়েটি যেন দিন দিন আপনার দেহ ও মনের উপর একটা বার্দ্ধক্যের আবরণ টানিয়া দিতেছে। অতুল বেদনাহত কণ্ঠে পুনরায় বলিল, আপনার কি আর কেউ নেই ?

সুমতি অলক্ষ্যে চক্ষের জলটা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, মা বাবা

সব আছেন কিন্তু তাঁরা আমায় নেবেন কেন? আর আমাকে উদ্ধার করবার কি জগতে কেউ আছে, অতুলবাবু?

অতুল চুপ করিয়া রহিল এবং একটু পরে, আচ্ছা চললুম, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দু তিন দিনের মধ্যে বিনয়বাবু ভাড়া না পাইয়া অবিনাশকে উঠাইয়া দিলেন। অবিনাশ চক্ষের জল ফেলিয়া রুগ্না পত্নীকে লইয়া পিসীর বাড়ী গিয়া উঠিলেন।

অতুল ইহা দেখিয়া বলিল, আমারও আর এখানে থাকৃতে ইচ্ছা নেই দাদা।

ধনুবাবু বলিলেন, কোথায় য়াবি? অল্প ভাড়ায় এমন স্থবিধে আর কোথায় পাবি?

অতুল আপন মনে বলিল, তা বটে, ভাড়াটে বাড়ী এর চেয়ে আর ভাল হয় না। আচ্ছা দাদা, সে বোষ্টমটা গেল কোথায়?

কোথায় গেল তা আমি কি জানি, ওর বউকে জিজ্ঞেস্ ক'রে আয় না?

অতুল একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিনয়বাবু বাড়ী ছিলেন না। হরিপ্রিয়া চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া ছিল। ধনুবাবু এদিকে আপনার ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। অতুল এই অবসরে একবার নীচে নামিয়া গেল। আস্তে আস্তে ঘরের সেই একমাত্র জানালাটি দিয়া দেখিল সেই কেরো-সিনের ডিবেটি স্থমুখে রাখিয়া কাঁথার উপর বসিয়া স্থমতি পরণের কাপড় খানারই স্থমুখের আঁচলটা সেলাই করিতেছে। সে দৃশ্য সহসা

দেখিয়া অপাঙ্গ শিহরণে অতুল মুহূর্ত্তের জন্য অবশ হইয়া পড়িল। পরক্ষণেই আস্তে আস্তে বলিল, শুনুন ?

সুমতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কাপড় সংযত করিয়া লইল, তারপর অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, আজ আমার কি ভাগ্যি, আপনি যে আমায় ভোলেন নি ?

না, ভুলব কেন। এবং আরও কিছু বলিতে গিয়া হঠাৎ সুমতির বাঁ হাতের দিকে নজর পড়িতেই সে শিহরিয়া বলিল, অত বড় ঘা আপনার হাতে ?

যদিও অজ্ঞাতে হাতটা কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু আজ সুমতি তাহা আর লুকাইল না, বরং একথা শুনিয়া হেঁট হইয়া পায়ের কাপড়টা একটু তুলিয়া বলিল, এই পায়েতেও অমনি, তা ছাড়া পিঠে গায়ে আরও—

কে এমন কল্লে ?

মৃদু হাসিয়া সুমতি বলিল, কে জানেন না ? কোনও দিন হয় ত সময়ে আলো জ্বালা হয়নি, অমনি সেদিন আমার গায়ে একটা কালশিরে পড়া চাই। কোনদিন চাল নেই, কোনদিন বা কাজ কর্ত্তে একটু বেলা গেছে, সেদিন অমনি শিক্ পুড়িয়ে ছেঁকা দেওয়া চাই, বলিয়া সে একটু একটু হাসিতে লাগিল।

অতুল বলিল, আপনি তবে আর এখানে আছেন কেন ?

কোথায় যাব তবে অতুলবাবু ?

যেখানে হয় চলে যান্, শেষকালে কি মারা যাবেন ?

সুমতি হাসিয়া বলিল, মারা যাবার জন্যেই ত আরও আছি।

অতুল সে কথা না শুনিয়া বলিল, আমার সঙ্গে যেতে চান? আমি আপনাকে আপনার দেশে গিয়ে রেখে আসতে পারি।

তাঁরা যদি আমায় না নেন্?

অতুলের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, জোর গলায় বলিল, বেশ মা-বাপ হয়ে যদি তাঁরা না নেন্, তখন আমি ত আছি? আমার দাদা দেবতা, আমি বললে তিনি অমত করবেন না,—বলিতে বলিতে সুমতির চক্ষে জলের ফোঁটা দেখিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে বাহিরের হাওয়ায় চলিয়া গেল। গেল বটে, কিন্তু একটা কথা কেবলই বাহিরে গিয়া ভাবিতে লাগিল, এই নির্জ্জন অন্ধকারে সে সুমতির দরজায় গিয়া 'শুনুন' বলিয়া ডাকিয়াছিল কি জন্য!

সকাল বেলায় এক সময় অতুল বলিল, আচ্ছা দাদা বোষ্টমটা কি রকমের লোক?

তাইত সেটা আমিও ঠিক ভেবে পাইনে।

লোকটা তেমন ইয়ে নয়, না?

বোধ হয় তেমন ইয়ে নয়, নইলে বউটাকে মারে কেন, খেতেই বা দেয় না কেন? কাল রাতের কাণ্ড শুনেচিস্?

কি?

তুই তখন ঘুমিয়েছিলি! গভীর রাত, কোত্থেকে গোঁ গোঁ শব্দ শুনে বাইরে গিয়ে তাকিয়ে দেখি মেয়েটাকে মুখ বেঁধে ঠেঙ্গাচ্চে—

অতুল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, কেন?

কেন সে অনেক কথা, তুই নাকি ওর সঙ্গে কথা কয়েছিলি—

কে বললে?

তা কি জানি, বোধ হয় বিনয়বাবুই বলেছে—

অতুল বিবর্ণ মুখে জানালার ধারে গিয়া আবার বসিয়া পড়িল এবং বসিয়া বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিল, যা হ'ক একটা চাকরী বাকরি জুটাইয়া সুমতিকে সে নিজের কাছে রাখিয়া দিবে, তাহাতে যত কলঙ্কই হ'ক সে সহ্য করিবে। হঠাৎ দুপুরবেলা একগাছা ছড়ি হাতে করিয়া সে রাস্তার এক পাশে বসিয়া প্রেমানন্দের অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু আবার কোন্ এক সময় তাহার প্রহারের প্রবৃত্তি চলিয়া গেল। বাড়ীতে আসিয়া জামা জুতা পরিয়া সে তাড়াতাড়ি চাকরীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

দিন চারেক পরে একদিন ভোর বেলায় অতুল বাহির হইল, সারাদিন বাড়ী ফিরিল না। সন্ধ্যার পর যখন ফিরিল তখন ধনুবাবু আপনার ঘরে বসিয়া বিনয়বাবুর পেটের পীড়ার জন্য ঔষধ বাছিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে তোর এত দেরি ? সারাদিন নাওয়া-খাওয়া নেই ?

অতুল সে কথায় কান না দিয়া বলিল, একটা চাকরী জোগাড় করিছি, মাইনে খুব অল্পই, তা হ'ক্—

যোগাড় করিছিস্—কোথায় ?

সে একটা আফিসে। শোন, একটা বাড়ীও ঠিক করে এসেছি, কালই আমরা সেখানে উঠে যাব, যেন অমত ক'রনা। আর একটা কথা—

ধনুবাবু বলিলেন, অমত করব না, আমারও আর এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই। একে একে সকলেই চলে গেল।

অতুল জামা ছাড়িতেছিল, বলিল, অবিনাশবাবু গেছেন, আর কে ?

বোষ্টমটাও তার বৌকে নিয়ে চলে গেল।

কে ? বলিয়া অতুল টলিতে টলিতে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

ধনুবাবু বলিলেন, ওই যে আমাদের বোষ্টমটা ; হতভাগা যাবার সময় কি রকম হিঁচড়ে বউটাকে টেনে নিয়ে গেল ! আর বউটার কি কান্না ! বলে' আজকের রাতটা আমায় রাখ' তোমার পায়ে পড়ি' । তার কান্না দেখলে পাষাণও গলে যায় ।

থর থর করিয়া অতুলের দেহটা কাঁপিয়া উঠিল । জীবনের একটা মস্ত বড় ঐশ্বর্য্য কে যেন তার বুক খালি করিয়া সবলে ছিনাইয়া লইয়া গেল ! তেমনি ভাবেই দেয়ালের ধারে বসিয়া পড়িয়া ঢোক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, চলে গেল ? আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলুম !

কি কথা ?

কিছু না । বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে নীচে নামিয়া গেল । দেখিল, কোথাও কেহ নাই । শূন্য যমপুরীর মত অন্ধকার ঘরগুলার অসহ্য রিক্ততায় বাহির কেবলই খাঁ খাঁ করিতেছে । তাহার অজ্ঞাতে সুমতি যে কতখানি তাহার ভিতরটা অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহাই আজ এই নির্জ্জন আঁধারের বুকের উপর দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে অতুলের চক্ষে জলের স্রোত বহিয়া গেল ।

* * *

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে বোধ হয় চার বছর হইবে । শীতকাল, তাহার উপর আকাশ ডাকিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছিল, এক একটা জলো হাওয়া ঠিক যেন বরফের কণা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল ।

সন্ধ্যাবেলা ছাতিটি মাথায় দিয়া অতুল আফিস হইতে ফিরিতেছিল । কাপড় চোপড় বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে । পায়ের জুতাটাও ভারি হইয়া উঠিয়াছে । রাস্তায় জনমানব নাই । বউবাজারের একটা সরু গলির ভিতর দিয়া সে আসিতেছিল । কিন্তু বৃষ্টিটা জোরে আসিয়া

পড়াতে জীর্ণ ছাতাটি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। সে একটা বাড়ীর দরজায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ পিছন হইতে তাহার পিঠে একটা আঙ্গুলের টিপ দিয়া কে বলিল, চিন্‌তে পারেন ?

অতুল চমকিয়া মুখ ফিরাইল এবং দেখিয়াই চিনিল, সুমতি!

সুমতি পুনরায় হাসিয়া তাহার অঙ্গের বহুমূল্য আবরণ দোলাইয়া বলিল, গায়ে হাত দিলুম, কিছু মনে করবেন না,—

অতুল বিবর্ণ মুখে বলিল, আপনি এখানে ?

কি করি বলুন, পেটের দায়ে—সে বোষ্টমটা ত ফেলে পালাল, আপনিও ত তথৈবচ,—

অতুল আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আপনার মনের ভিতরটায় একবার তলাইয়া সেই চার বছর পূর্ব্বেকার কয়টা দিনের কথা ভাবিয়া লইয়া তারপর কি একটা কথা বলিবার জন্য মুখ তুলিতেই দেখিল এই কুহকিনী নারীটির চোখের সেই বহুপুরাতন অশ্রু কয় ফোঁটা ওই কানের দুল দুইটার মতই চক্ চক্ করিতেছে। সেই অশ্রু! যা' একদিন তার সমস্ত সংস্কারের বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু আজ ইহাতে আর সে মাদকতা নাই। কেন ?—কেন তা' সে জানে না!

তাই সে বলিল, পারেন ত আমায় মাপ করবেন। বলিয়া রাস্তায় নামিয়া গেল। যাইতেই সুমতি চক্ষের দুইটি ধারা ত্রস্তে মুছিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, একটা পান খেয়েও গেলেন না ? বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুমুখের বাড়ীর দরজা হইতে একটা স্ত্রীলোক বলিল, ও কে রে ?

সুমতি হাসিয়া বলিল, উনিও এক কালে আমার দরদী ছিলেন।

অতুল কথাটি শুনিল কি শুনিল না, তাড়াতাড়ি ছাতাটি খুলিয়া বাড়ীর পথে চলিয়া গেল।

কোনো একরাত্রে

ঘরের জান্‌লায় গরাদ নেই; কোন্ অতীতকালে গৃহস্থের অত্যাচারে গরাদগুলি আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তারা ধ্বংস হয়েছে। পল্লী-গ্রামের এই অন্ধকার রাত্রে যদি কোন বন্য জন্তু গুটি গুটি এসে জান্‌লা দিয়ে ঢোকে তবে তাকে বাধা দেওয়া যাবেনা। দরজাগুলির পাল্লা নেই, সম্ভবতঃ জনহীনপুরী দেখে গ্রামের লোকেই সেগুলি খুলে নিয়ে গেছে। বাতাসের শব্দে মনে হচ্ছে, বিগত দিনের মত নরনারীর শেষ নিশ্বাস এখনো বুঝি মিলিয়ে যায়নি; আজো তারা জীবনের কিছু প্রত্যাশা নিয়ে অশরীরী হয়ে রয়েছে। নির্জ্জন অন্ধকারে আমি এক-বার মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। দেখলাম না কিছুই, কিন্তু চামচিকার পাখার শব্দটা এখনো শুনতে পাচ্ছি,—শুনতে পাচ্ছি ঘরের কড়িকাঠে পোকা এখনো ঘুরে ঘুরে খাচ্ছে; ভিতরের দেয়ালে যে ছোট বটগাছটা শিকড় বিস্তার ক'রে মেঝের দিকে নেমে এসেছে, তার একটি শাখা গলা বাড়িয়ে আকাশের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে,—তারই তলায় কোথায় ডাকছে ঝিঁঝিঁ, কোথায় শুনছি নানা পোকার সশব্দ জটলা,—অন্ধকারকে তারা যেন গভীর ভাষায় ভরে তুলছে, যেন নিশীথ রাত্রির আত্মার বাণী।

একান্তে একটি বিছানা পেতেছি, ভাবছি মশারি টাঙ্গানো নিতান্তই

দরকার। এখানে বাস করবার আয়োজন নেই, থাকবার কথাও নয়; আজ বিকাল বেলায়ও এই অকল্পিত নির্ব্বাসনের সুদূর সম্ভাবনাও জানা যায়নি। মোমবাতি একটু খানি ছিল, সেটুকু জ্বলে জলে শেষ হয়ে গেছে। দেশলাইটা বার বার জ্বালতে ভয় হচ্ছে—অন্ধকারের মধ্যে বসে নিজেকে প্রকাশ করতে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। হাঁ, আমি নার্ভাস। আত্মপ্রকাশ করতে আমার ভয় লাগছে।

ভগ্ন জীর্ণ জনহীন প্রাসাদের একখানি কঙ্কাল—সুমুখে খানিকটা খোলা মাঠ, তারই উপর কয়েকটা নিষ্ফল নারিকেল গাছ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদেরই অদূরে একটা বাঁশের বন। এতক্ষণে পথের ধারে একটি আলোকের রেখা দেখা গেল; সে আলো নিকটতর হয়ে আসছে। একটু আশ্বস্ত হলাম।

আলোটা এসে ঢুকলো অন্দরে, সোজা উঠান পার হয়ে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে এসে দাঁড়ালো আমার কাছে। এতক্ষণ যেন অভিভূত হয়েছিলাম, এবার বললাম, মশারি এনেছ?

চন্দ্রনাথ একটু হাস্‌লো। বললে, এরা কাছাকাছি থাকে কিন্তু কামড়ায় না। তোমার এত প্রাণের ভয়?

—প্রাণের ভয় নয়, সাপের ভয়!

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পুনরায় বললাম, তোমার জন্যে, এবার বুঝেছি তোমার জন্যে গাড়ী ফেল হয়ে গেল। আমি চলে যেতে পারতাম, পৌঁছতে পারতাম এতক্ষণে নিজের দেশে, শহরে—এ শাস্তি হলো কেবল তোমার জন্যে।

চন্দ্রনাথ বললে, সবই নিয়তির কাণ্ড, বুঝলে হে?

—চুপ, তুমি চুপ কর চন্দ্রনাথ; তুমি যা বলো শুন্‌বো, শুন্‌বো না

তোমার নিয়তি, তোমার দর্শন, তোমার প্রলাপ; তুমি চুপ করো চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, মশারি এনেছি আলোটাও নিয়ে এলাম তোমার জন্যে। তোমার যেন কষ্ট না হয়; কারণ তুমি অতিথি।

—বেশ, আর কিছু দরকার নেই, এবার তুমি যাও। না না, গল্প করতে আমি ভালবাসিনে ও আমার রুচি নয়। এবার তুমি যাও।

—যাবো কোথায়, আমি যে থাকতে এলাম—

—থাকতে এলে? মানে? থাকতে চাও তুমি আমার কাছে?—বলতে বলতে সোজা হয়ে বসলাম,—তোমাকে আমি সহ্য করতে পারিনে চন্দ্রনাথ, তোমার দিকে তাকালে ভয়ে আমার গলা বুজে আসে, হতাশায় আমার চোখ কাঁপে,—তুমি চলে যাও, তুমি থাকলে এই অন্ধকার আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে; তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও।

ভিজা তবলার উপর হাত চাপড়ালে যেমন তার শব্দ হয় তেমনি আমাদের দুজনের গলার আওয়াজ এই ভগ্ন কক্ষের কোণে-কোণে ঢব্-ঢব্ করতে লাগলো। চন্দ্রনাথ বল্লে, হ্যাঁ, মতলব আমার একটু ছিল; ইচ্ছে ছিল ট্রেণটা যেন তোমার ফস্‌কে যায়, অনেক দিন তোমার সঙ্গে গল্প করিনি।

—গল্প করবো তোমার সঙ্গে? কেমন গল্প সে?

—কিন্তু আগে ত তুমি বেশ গল্প করতে আমার সঙ্গে?

—আগে করতাম, এখন নয়। আগে মানুষের উপর তোমার শ্রদ্ধা ছিল, তুমি মূল্য বুঝতে স্নেহ-মমতার—থাক চন্দ্রনাথ, সে তোমার গত জন্ম, তুমি সেদিন মানুষের মধ্যে মানুষ ছিলে। কিন্তু আজ তুমি যাও, তুমি কাছে থাকলে আমার সব আশা, সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়।

—স্বপ্ন ?—চন্দ্রনাথ ঠোঁট উল্‌টে আবার হাস্‌ল। আমি চিনি তার হাসি, তার হাসির বাহ্য চেহারাটা নির্ম্মল ও মধুর কিন্তু সে হাসির প্রাণ বিষে ভরা, বিদ্রূপে জর্জ্জরিত অপরিসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মেশানো অপরিমিত অবিশ্বাস। বললে, এখনো স্বপ্ন দেখছো নাকি ?

—হ্যাঁ, দেখছি, লজ্জা কিছু নেই। স্বপ্ন দেখছি ; বিংশ শতাব্দীতে এখনো স্বপ্ন দেখি, প্রাচীন বলে তাকে ঠাট্টা করবে, এইত ? করো। আমার হৃদয়ে আছে সম্বল, তাকে আমি মরতে দেবো না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, আমার কথা তাহলে তুমি কিছু শুনবে না, কেমন ?

—না—আমি বললাম, শোনবার মতো কথা তোমার কিছু নেই। জানি তুমি যা বলবে ; তোমার মনের চেহারা আমি জানি, এই রাত্রির চেয়েও তুমি ভয়ঙ্কর। তোমার কাছে এলে আমার সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। নির্ম্মূল হয়ে যায় আমার যা কিছু—

—কিন্তু তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

—ভয় পাই, ঝড় এলে যেমন ভয় পায় গাছপালা, আগুন জ্বলে উঠলে যেমন ভয় পায় বাতাস ; চন্দ্রনাথ, তোমাকে দেখলে মনে হয়, জীবনের কোনো অর্থ নেই ; বন্ধুত্ব, বাৎসল্য, দয়া, প্রেম সব নিরর্থক।

চন্দ্রনাথ আড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। তারপর একটু হেসে বললে, তুমি বড় দুর্ব্বল হে, বড় ভঙ্গুর।

—হ্যাঁ, বড় দুর্ব্বল, বড় ভঙ্গুর। এই ভালো, বেশ আছ। আমি বুঝতে চাইনে তোমার সহজ কথাটা শাদা চোখে। আমি বুঝতে চাইনে তোমার ইউটিলিটির কথা। আমার চোখে থাকুক কাজল, মনে থাকুক রঙ, আমার ভাল লাগে মেঘের মায়া, গাছের ছায়া। তুমি আমাকে বারে বারে মরুভূমির পথ দেখিয়ে দিয়ো না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ বললে, তোমার মন দেখছি বুদ্ধির আলোয় উজ্জল নয়।

—না হোক—আমি বললাম,—বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির উদ্ধত তাল-ঠোকাঠুকি। সেখানে কোথাও প্রাণের ঐশ্বর্য্য নেই, সেখানে কেবল বস্তুর ভার, লগেজের উপরে লগেজ, আঘাতে আর সংঘাতে উৎপীড়িত।

—কিন্তু তোমার ভাল লাগে কি, শুনি ?

—তোমাকে সে সব কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না, চন্দ্রনাথ তুমি তার অধিকারী নও। এমন কথা যে বলে প্রেমের ফুল ফোটে দেহ-লালসার জীব থেকে, যে কোনো মহাত্মার জন্ম বৃত্তান্ত অতি কলঙ্কময়—তার সঙ্গে আমার তর্ক নেই। আমি একথা জান্‌তে চাইনে সূর্য্যকিরণ মানে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণধারণের রস, মেঘ মানে শস্যক্ষেত্রের ইউটিলিট, নদী মানে লোকের তৃষ্ণার জল !

—আর প্রেম ? বিদ্রূপ করে হেসে বললে চন্দ্রনাথ।—শুন্‌বে আমি একটা বেশ জুতসই প্রেমের গল্প বলবো ?

—না, না চন্দ্রনাথ, না সব সইবে, কিন্তু সইবে না তোমার প্রেমের গল্প। তুমি আমাকে বোঝাতে চেয়ো না, প্রেম মানে বিধাতার জীব-সৃষ্টির চক্রান্ত। বোঝাতে চেয়ো না পরস্পরের স্নায়ুতন্ত্রিক উত্তেজনা, ইমোশ্যন মানে শিরার সঙ্গে শিরার কলহ-কোলাহল।

চন্দ্রনাথ বললে, কিন্তু হৃদয় বলে নাকি একটা পদার্থ আছে তোমাদের ?

রাত্রি হয়ত বা শেষ হয়ে এসেছিল। বহু চেষ্টা করলাম চন্দ্রনাথকে বিতাড়িত করবার জন্য। সে গেল না, অপমান করলেও সে মানে না। আলোটা জ্বলতে লাগলো, মশারী টাঙ্গানো হলো না, সেও বসে রইলো চুপ করে। তার মতো চরিত্রবান মানুষ আমি দেখিনি, কিন্তু চরিত্রই

তার উন্নতির পক্ষে বাধা, সৌজন্যের জন্যই সংসার থেকে সে বরখাস্ত হয়েছে।

—এই যারা বড় হয়েছে তাদের সত্যিকার ইতিহাস তুমি জানো? যাদের নাম ছাপালে খবরের কাগজ বিক্রী হয়, যারা হয় বড়-বড় সভার সভাপতি, রাষ্ট্রনেতা বলে যারা নিজেদের নাম জাহির করেছে, সমাজ সংস্কারক যারা—বলে যারা পরিচিত। তাদের কথা বলব তোমার কাছে? —চন্দ্রনাথ বলতে লাগলো, নাম শুন্‌লেই তুমি চিনবে তাদের? প্রতি- দিনের জীবনে কি দৈন্য আর ক্ষুদ্রতা, তুমি শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবে।

বললাম, এর দ্বারা তুমি কি বলতে চাও?

—বলতে কিছুই চাইনে; দেখি, তাই বলে যাই। ইচ্ছে যায় তোমাদের সমালোচনা করতে। 'বড় হলেই বড় হওয়া যায় না। বড় মানুষ তুমি দেখেছ? জানো বড় মানুষ কাকে বলে?

—যাক চন্দ্রনাথ, উত্তেজনায় তুমি হয়ত সীমা ছাড়িয়ে যাবে, তুমি সীমা ছাড়ালেই আমি যাবো ভেসে। এখন বলো তোমার প্রেমের গল্প।

—কাহিনীই আছে কিন্তু প্রেম নয়—চন্দ্রনাথ বল্‌লে, সেই কিস্তি আর সেই কিস্তিমাৎ, সেই চিরপুরাতন, কেবল চালের তফাৎ, কেবল তফাৎ ঘটনার—

—তবুত সবাই শুন্‌তে চায় চন্দ্রনাথ!

—শুন্‌তে চায়, তার কারণ, মানুষ যে কখনো পুরোনো হয় না মানুষের কাছে, আনন্দ বেদনার নানা চেহারা, নানান ষ্টাইল, সে ত তুমি জানো!

এমনিই চন্দ্রনাথ জীবনে দেখেছে অনেক, তাই তাকে ভয় করে। তার অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক ইতিহাস, অনেক সহ্য করেছে সে,

সাধারণ মানুষ তাই তাকে সহ্য করতে পারে না, ভয় পায়। মানুষের কোনো ত্রুটি তার চোখ এড়ায় না, মনে হয় সে যেন সমস্তই জানে, সমস্তই বোঝে।

তুমি কি পেয়েছ এতকাল ?—চন্দ্রনাথ বল্‌তে লাগলো, অনেক ত ভালোবেসেছ, অনেক দোলায় দুলেছ, কী পেয়েছ বলো ত ?

বল্‌লাম, পাবার জন্যই বা এত লালায়িত কেন ? না পেলেও ত চলে যায় মানুষের।

—চলে না। ব'লে চন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর এক সময় বললে, চলে না হে, চলে না ; কিন্তু দোষ কার জানো ? —তোমার ! মরুভূমির উপর দিয়ে ত মেঘ চলে যায় কিন্তু দোষ মেঘের নয়, তোমার। তুমি কেবল ফাঁকি দিলে, কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা, কেবল রইলে জ্ঞানের অভিমান নিয়ে, বুদ্ধির দম্ভ নিয়ে। তোমার উপর বর্ষণ হবে কেমন করে ? কী আছে তোমার সম্বল ?

নীরবে বসে রইলাম। হঠাৎ পুনরায় উত্তেজিত হয়ে চন্দ্রনাথ বললে, তোমারি কি কম গলদ ? কেবল ভঙ্গি, কেবল কসরৎ, এক ছটাকও পুঁজি তোমার নেই। ওপরে তোমার যত পালিশ ভেতরে তত দৈন্য : কাঁচের মতো তুমি সৌখীন, পার্শী মেয়ের মতো তোমার সাজসজ্জার চটক, কেবল বিজ্ঞাপন, শুধু আড়ম্বর—সত্যকার জীবনের সঙ্গে তোমাদের কোনো পরিচয় নেই। পুঁথিগত বিদ্যে তোমাদের, তোমরা জীবনের ব্যাখ্যা করো চায়ের দোকানে বসে মিথ্যা নিয়ে পরের মুখের বুকনি নিয়ে তোমাদের ফলাও কাজ কারবার।

এবার সে চুপ করলো, আমিও বাঁচলাম। মানুষ নেশার মুখেও

এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত কথা বলে। চন্দ্রনাথের মাথার একটা স্ক্রু আলগা রেখে বিধাতা তার সঙ্গে একটু বিদ্রূপ করেছেন।

ভোর হয়ে এল বোধ হয়, বাঁশের বন একটু-একটু স্বচ্ছ হয়ে আসছে। বল্‌লাম, প্রথম ট্রেণেই আমি যাবো কিন্তু সাড়ে ছ'টায় গাড়ী নয় ?

চন্দ্রনাথ বললে, হ্যাঁ, একটু ঘুমোও, আমি ঠিক সময় জাগিয়ে দেবো মশারীটা এবার ফেলে দিই, কেমন ? বলে সে বেমক্কার মতো চোখ বুজে পাশ ফিরে ঘুমুলো।

মুক্তি

নাটমন্দিরের নাচ শুরু হয়েছে। গায়িকা উঠে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে চেয়ে একটু হেসে নমস্কার করলে। জরির কাজ করা তার গায়ে পাতলা আবরণ! উজ্জ্বল আলোয় তার ওপর ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে পড়ে!

নিস্তব্ধ নির্ব্বাক দর্শকমণ্ডলী ঘাড় নেড়ে তাকে উৎসাহ দিলে।

সুমুখে কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূর্ত্তি! গায়িকা মুহূর্ত্তমাত্র তার দিকে মুদিত দৃষ্টিতে চেয়ে আপনার গায়ের আবরণ খানি মাটিতে নিক্ষেপ করলে। আজানুকণ্ঠ সূক্ষ্ম নাচের পোশাক তার গায়ে গায়ে জুড়ে আছে।

প্রথমে ভূমিকা ; তারপর নাচ। সমস্ত দেহখানি হিল্লোলিত ক'রে নৃত্যশীলা গায়িকা দেখতে দেখতে রাত্রির চেতনাহীন মোহকে উচ্ছ্বসিত করে তুললে। দর্শকগণ তার সুস্পষ্ট প্রত্যেক অঙ্গটির দিকে সুরা-বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

মুক্তি

বাহিরে তামসী রাত্রির নিবিড় নিস্তব্ধতা! অদূরে পূর্ণতোয়া কলস্বনার উচ্ছল স্রোত বয়ে চলেছে! কলস্বনার তীরে প্রতিদিন এমন সময় বাঁশী বাজে। গায়িকা নাচে আর কান পেতে সেইদিকে শোনে। তার সেই নৃত্যের মধ্যে সে কি কারুণ্যের রস! তালে ভঙ্গিতে, লীলায়,—যেন পৃথিবীর সমস্ত কান্না ফেনিয়ে ওঠে। অথচ বাঁশী না বাজলে গায়িকা নাচ শুরু কর্ত্তে পারে না। তার সুরের মধ্যে অন্তরলোকের যে চির মৌন আর্ত্তনাদ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়,—গায়িকা সেই ভাষাহীন রহস্যময় শব্দটিকে রূপায়িত করে তোলে।

কিন্তু এ বাঁশী যে বাজায় তাকে গায়িকা কোনদিন দেখেনি।

বাইরে সেই বাঁশীর আওয়াজ—ভিতরে এই পরিপূর্ণ যৌবনের নৃত্য—দর্শকেরা নিশ্চল হয়ে চেয়ে থাকে। জল স্থল আকাশ পরিব্যাপ্ত করে যে সুর প্রকৃতির এক প্রান্ত হতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বাষ্পাকুল করে তোলে, তারই সঙ্গে সমসুরে গায়িকার প্রতি অঙ্গ যেন আকুল হয়ে ওঠে।

ক্রমে রাত্রি ঘন হয়ে আসে। মন্দিরের আলো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়। বদ্ধ অশ্রুর চাপে চারিদিক জমাট হয়ে ওঠে। রাত্রির মুহূর্ত্তগুলি যেন নিশ্চল, কলস্বনার স্রোত যেন থেমে গেছে, বনে-বনান্তরে মর্ম্মর-ধ্বনি বুঝি আর জাগে না; জীবজগৎ গাছপালা, আকাশ পাতাল,—সমস্ত বিশ্বলোক এই সুন্দরী নৃত্যশীলার সূক্ষ্মতম আবরণের মধ্যে সমস্ত নগ্ন দেহখানির লীলায়িত ভঙ্গির দিকে বিপুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। নাচের ভূমিকায় যে দর্শকমণ্ডলী লালসাতুর পশুর মত গায়িকার অবয়বের দিকে তাকিয়ে হাঁস ফাঁস করে, এবার তারা মানুষের মধ্যে ফিরে আসে। রুদ্ধ নিশ্বাসে গায়িকার দিকে তারা সজল চোখে চেয়ে থাকে।

তারপর কলস্বনার উপকূলে বাঁশী আর বাজে না। গায়িকার নাচও সেই সঙ্গে থেমে যায়।

দর্শকেরা তখন জেগে ওঠে। নায়িকা সেই নিক্ষিপ্ত আবরণ খানি তুলে আবার নিজের গায়ে ঢাকা দিয়ে আড়ালে চলে যায়।

মূক দর্শকবৃন্দ সাশ্রুনেত্রে ঘরে ফেরে।

এমনি প্রতিদিনই!

কিন্তু প্রতিদিনের নাচের সঙ্গে প্রতিদিনের মিল নেই। এইটুকুই বিস্ময়। প্রতিদিন নব নবতর রূপে, রসে, প্রকাশে, বেদনায়, কারুণ্যে গায়িকার নির্ব্বাক নৃত্য সকলকে অভিভূত করে তোলে।

আর সে কী তার যৌবনশ্রী! মনে হয়, মাটীর কানায় কানায়, কলস্বনার উর্ম্মিরেখায়, আকাশের কিনারায়, বাতাসের ইসারায় তার যৌবনের আবেগ রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে।

গায়িকা মধুর হাসি হেসে বলে—আমার নিজের শক্তি ত কিছু নেই, বাঁশী বাজে বলেই আমি—

শিল্পীর স্বাভাবিক বিনীত উদারতা ভেবে সবাই চুপ করে থাকে।

কিন্তু কে এবং কোথায় এই বংশীবাদক!

তারপর আবার বাঁশীর করুণ স্থর রাত্রির অন্ধকারে শেষ নিশ্বাস ফেলে মিলিয়ে যায়, দেখতে দেখতে গায়িকার লীলায়িত তনুলতাটির নৃত্যভঙ্গিও থেমে আসে।

দিনের ওপর দিনের লুণ্ঠন চলে এমনি করেই।

সেদিন দর্শকেরা চলে যাবার পর মন্দির জনশূন্য হলে গায়িকা ধীরে

ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। দূরের বাঁশীর আওয়াজ একটু আগেই থেমেছে। সেইদিকে লক্ষ্য করে বরাবর সে নদীর ধারে এল।

চাঁদিনী রাত্রি। পাড়ের কাছে নদীর জল চক্‌চক্ করছে। গায়িকা চারিদিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখলে কোথাও কেউ নেই। নদীর স্রোত যেদিক হতে এসেছে আর যেদিকে মিলিয়ে গেছে— দুইদিকে শুধু অস্পষ্ট সাদা আকাশ। এক আকাশ তারা চন্দ্রালোকে ম্লান হয়ে গেছে।

গায়িকা সেদিনের মত ফিরে গেল। হাসতে হাসতে আপন মনেই বললে—এ বাঁশী কেউ বাজায়, না আমার নিজের মধ্যেই বাজে!

কিন্তু রহস্য আর রহস্য থাকতে চায় না।

সেদিন উন্মুখ ব্যাকুল দর্শকবৃন্দকে ফাঁকি দিয়ে গায়িকা মন্দিরের পিছনের দ্বার পথে বাইরে বেরিয়ে এল।

বংশীধ্বনিতে আজ আর রহস্য নেই—স্পষ্ট, সহজ, সকরুণ।

নদীর পথে গায়িকা চলতে লাগলো। এ এক অচেতন পথ চলা! এ পথের কোথায় সুরু আর কোথায় শেষ,—সে যেন নিজেই জানে না। মনে হল সে ছাড়া, এই বিশ্বব্যাপিনী প্রকৃতি শরাহতা কপোতীর মত ভাষাহীন বেদনার রক্তে ডুবে থর থর করে কাঁপচে। বাঁশীর প্রত্যেক গমকে যেন পৃথিবী নব নব রঙ্গে রঙিন হয়ে উঠছে, নব নব জাগরণে জেগে উঠছে।

মাটির তলায় এ বিশ্বের নির্ব্বাসিত নিদ্রিত আত্মা বিদীর্ণ ধরিত্রীর মাঝ থেকে উঠে এসে যেন বলতে চায়, থামাও—বাঁশী তোমার থামাও। মৃত্তিকার প্রাণরহস্যকে জাগিও না। মানুষকে কাঙাল কর না!

ক্রমে কাছে গিয়ে গায়িকা বংশীবাদককে দেখতে পেলে। যুবক সুন্দর সুপুরুষ! মাথায় শিকড়ের মত জটা জটা চুল। পিছন দিকে গিয়ে নিঃশব্দে সে দাঁড়ালো।

এই নির্জ্জন নদীতীর, সুমুখে অপরিচিত পুরুষ, সে যে সুন্দরী যুবতী,—এ সব আর তার খেয়াল নেই।

অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। পা দুটি ভারি বোধ হচ্ছে। শরীর কেমন যেন অবসন্ন হয়ে আসচে। মনে হল, তার মূল্যবান গাত্রাভরণ গুলিও আজ নিতান্ত গুরুভার বোধ হচ্ছে

এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গায়িকা আবার নিজের পথে চলে গেল।

পরদিন ঠিক সময় আবার সে ঠিক সেই জায়গাটিতে এসে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো। আজ কিন্তু আর একটু কাছে।

বাঁশী তেমনি একমনে বেজে চলেছে—কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কি ছাই নাচ!—গায়িকা ভাবে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে সে অদূরে বালুচরের ওপর চুপ করে বসলো। সে যেন নিতান্ত দীন—নিতান্ত দরিদ্র!

আর একটু কাছে সরে গেল।

এতক্ষণে বাঁশী থামলো। গায়িকা চমকে উঠতেই তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

যুবক একবার মাত্র তার দিকে ফিরে তাকালে, তারপর আপন মনেই উঠে ধীরে ধীরে চলে গেল।

সে যে একটা জীবন্ত মানুষ, যুবতী নারী সে, সে যে জন্তু জানোয়ার অথবা জড় পদার্থ নয়,—যুবকের মুখে এসব কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। চাঁদের আলোয় ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

গায়িকাও নিতান্ত ভারাক্রান্ত মনে আপনার পথ ধরলে।

রাত্রির অবগুণ্ঠনে আবার দিবালোকের মুখ ঢাকা পড়তে থাকে।

দুদিন আর গায়িকা সে পথে গেল না।—অভিমান!

মুখের দিকে একবার ফিরেও তাকায় না! অহঙ্কার কি তার এতই বড়!

কিন্তু তৃতীয় দিনেই আবার গায়িকা গিয়ে হাজির। এবারে আর পিছন দিকে নয়, পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাদকের কিন্তু হুঁস নেই। সে তখন বাঁশীতে বিভোর। অবশ দেহে গায়িকা কান পেতে শুনতে লাগলো। এমনি কতক্ষণ কে জানে! তারপর কখন্ নিজের অজ্ঞাতে সে এক-পা এক-পা করে একেবারে সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালো।

এ বাঁশীর উচ্ছ্বাসের কোন ভাষা নেই। মনে হচ্ছিল, সমস্ত বিশ্ব-সংসার অটল শান্তিতে স্তব্ধ হয়ে সুর শুনচে। ঘূর্ণীর গতি যেন থেমে গেছে।

গায়িকা নিঃশব্দে সেখানে বসে পড়ল। বংশীধারীর চমক ভাঙ্লো এতক্ষণে। বাঁশী থামিয়ে মুখ তুলে বললে—কি চাও?

গায়িকার মুখে কথা নেই। আকাশের পরিষ্কার চাঁদের আলো তার গায়ের আভরণে ঝক্ ঝক্ কচ্ছে। ঘাড় বাঁকিয়ে হেঁট হয়ে বালির ওপর আঁক কাট্তে লাগলো। যুবক স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো।

গায়িকা বড় অস্বস্তি বোধ কচ্ছিলো। এমন করে কেউ যে তার দিকে চেয়ে থাকতে পারে, এ সে জানতো না।

মুখ তুলে বললে—তাকাও কেন অমন করে?

যুবক একবার আকাশের চাঁদের দিকে চাইলে; তারপর হঠাৎ বললে—এত রূপ তোমার?—বলে সে হাতের কাছে পান-পাত্র তুলে নিয়ে কি একটা তরল বস্তু পান করতে লাগলো।

গায়িকা উঠে দাঁড়ালো, ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করে বললে—ছি ছি।—আর দাঁড়ালো না, দ্রুতপদে আপনার ঘরের পথে চললো।

কিন্তু পরদিন আবার যখন বাঁশী বাজতে সুরু করেছে, তখন দেখা গেল গায়িকা আবার সেই পথে আসচে। তেমনি শিথিল গতি, তেমনি অবশ তনু-মন। মগ্ন চেতনার মধ্যে তার তখন সুরের আগুন ধরে গেছে।

যুবকের কোনদিকেই খেয়াল নেই। গায়িকা ধীরে ধীরে এসে সুমুখে কাছেই বসলো।

যুবকের চোখে জল। বাঁশীর সঙ্গে তার চোখের জলের ভাষা মিলে গেছে। গায়িকা চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

এ এক দৃষ্টি! অভিভূত—অচেতন,—ঘুমন্ত!

তারপর আরও কাছে সরে এল। ধীরে ধীরে যুবকের গায়ে হাত রাখলে। মুখে হাত দিলে। গায়ে, মাথায়,—বুকে।

গায়িকার সর্ব্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপচে। জড়িত কণ্ঠে বললে—তুমি—তুমি কে?

বাঁশীর স্বরে যুবক বললে—আমি পুরুষ! তুমি কি জীবনে পুরুষ দেখ নি?

দেখেছি। কিন্তু তোমাকে কখনও—

পুরুষের স্পর্শও পাওনি কোনদিন?

গায়িকা নির্ব্বাক।

বাঁশী থেকে মুখ সরিয়ে যুবক গায়িকার একটি হাত ধরে বললে—তোমার যৌবনশ্রীর কি অর্থ জানো?

বোধহয় সে একটুখানি হেসেছিল—গায়িকা হাত ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি, উঠে দাঁড়ালো। বললে—কি?

যারা ভোগী তারা তোমার দেহকে নিষ্পেষণ কর্ত্তে চায়।

তুমি?

যুবক হেসে বললে—আমি! আমিও ত মানুষ! কিন্তু আমি সেই শক্তির অধিকারী, যে তোমার ওই রক্ত মাংস বাঁশীর ফুৎকারের মধ্যে উড়িয়ে দেবে।

গায়িকা মুখ তুলে চাইলে।

যুবক দূর নদীরেখার দিকে চেয়ে আবার বললে—শুধু থাকবে তোমার ওই সৌন্দর্য্যের আত্মা! যার ছোঁয়াচই আমায় শক্তিদান করবে।—বুঝলে?

গায়িকা ভয়ে ভয়ে উঠে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বাঁশী আবার বাজে। সে বাঁশী গায়িকাকে সংসারের প্রতি উদাসীন করে তুললে।

অলঙ্কার—আভরণ যা কিছু, সে খুলে ফেললে। প্রসাধন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কৃচ্ছ্রসাধন করে গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করলো।

আজকের এই বাঁশীর আওয়াজে তার কান্না আর থামতে চায় না। মাঠের বাঁশী যেন নিঃস্বের প্রলাপ গান।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গায়িকা যুবকের কাছে গিয়ে বললে

—এ তোমার কি প্রলোভন, আমি ছাড়তে পারি না যে! আমায় মুক্তি দাও, তোমার পায়ে পড়ি।

যুবকের পায়ে সে লুটিয়ে পড়ল। যুবক বললে—দেহের মুক্তি ত নেই গায়িকা!

তবে?

যার মুক্তি নেই, সে তোমার নয়। যে তাকে চায়—তারই।—যুবক তার হাত চেপে ধরলে।

গায়িকা ফুলে ফুলে কাঁদছিলো। বললে—তোমার ওই বাঁশীর কাছেই আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই।

কিন্তু তোমার দেহ যে বাধা।

আবার সেই হেঁয়ালী! গায়িকা শুধু বললে—তবে?

দেহের ভেলায় চড়ে তার কাছে যেতে হয়। লাফিয়ে ত ওপারে যাওয়া চলে না, গায়িকা! বাঁশী যে বাজায় সেই তোমার কর্ণধার।

উত্তরে যুবক কুৎসিত হাসি হাসলে। গায়িকা আর কোনও কথা বলে না।

যুবক আবার বাঁশী তুলে বাজাতে শুরু করলে। একহাতে বাঁশী বাজায়, আর একহাতে গায়িকার গায়ে হাত বুলোয়।

গায়িকা বললে—তোমার স্পর্শ এমন ভীষণ রোমাঞ্চকর কেন?

—আমি যে পুরুষ!

অভিভূতের মত গায়িকা বললে—তুমি কি চাও?

—রক্ত চাই, মাংস চাই, তোমার এই দেহের আগুনে ডুব দিতে চাই।

—যে এমন বাঁশী বাজায়, সে এত কুৎসিত কেন?

উত্তরে যুবক গর্ব্বিত কণ্ঠে বললে—যে বাঁশী বাজায়, সে অন্য একজন। তোমার মত লক্ষ সুন্দরীকে সে চায় না—আমি তোমাকে চাই। আমি সম্ভোগ ভালবাসি।

—সম্ভোগের মধ্যে আত্মা কি ক্লেদাক্ত হয় না?

—না। যদি আগুন থাকে।

ওকি, কাঁদো কেন অমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে?

নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে গায়িকার সে কী কান্না! নিজের হাত কামড়ে, চুল ছিঁড়ে, মাথা ঠুকে,—রোরুদ্যমানা গায়িকা যেন নিজেরই টুঁটি কামড়াতে চায়।

জীবনে সে পাপ করেনি। আজ আত্মহত্যা করে বসলো! লজ্জায়, ধিক্কারে, অপমানে, বেদনায় গ্লানিতে,—সে এক মর্ম্মান্তিক কান্না!

হয়ত তার ক্লেদাক্ত আত্মার আর্ত্তনাদ!

কিম্বা হয়ত তার ভিতরে কোথাও কোনদিন আগুন জ্বলেনি।

পরদিন ভোর রাত্রে সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, মন্দিরের কৃষ্ণমূর্ত্তির সুমুখে নাটমন্দিরে গায়িকার রক্তাক্ত অচেতন দেহ পড়ে আছে।

গলা কাটা। হাতের কাছে একখানা ধারালো অস্ত্র।

সেদিন থেকে বাঁশী আর বাজে না।

মাটির ঢেলা

পথ দিয়া গেলে লোকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে; শূন্য একটা পিপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিলে যেমন দেখায়,—ঠিক তেমনি। দেখিতে দেখিতে লোকের পেটের ভিতর হাসি ফেনাইয়া ওঠে।

দু'বেলা বাসন মাজে, বাড়ীখানা ধুইয়া দেয়, আর এটা-ওটা। এই-ত কাজ! বাজার করিতেও হয় না। পয়সা হাতে পড়িলে সে নাকি আর ছাড়িতে চায় না—সেই কারণে!

দোকানীরা বলে, এসো না বাপু তুমি, দোকানের এখনও বউনি হয়নি—যাও, উই ছাতুখোর বেটার দোকান থেকে মুড়ি কেনো গে যাও!

ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের দিকে চায়; তারপর ওই একটুখানি হাসিয়া তেমনি করিয়া থপ্ থপ্ করিতে করিতে ছাতুখোরের দোকানের দিকে চলে।

দোকানী বিড়-বিড় করিয়া বলে, হতচ্ছাড়া মাগির ঠামে-ঠামে চলা দেখ!

ছোট্টুলাল বাংলায় বলে, ছাত্তু লেবি এই—মাগী, আবার এসিয়েছে —বলিয়া কাঠের হাতলটা দিয়া তাহার গালে একটা ঠোনা দেয়।

আঁচল হইতে পয়সা বাহির করিয়া একটু হাসিয়া সে বলে, মুড়ি দাও! একটা লঙ্কাও দিও,—আর দুটি ছোলাসেদ্ধ ফাউ! দাও এই হাতে। বলিয়া বাঁ হাতটা পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

ছট্টু হাসিতে হাসিতে দুটি ছোলাসিদ্ধ তাহার হাতে দেয়, তারপর মাটি-পোরা একটি কুন্‌কের তিন কুন্‌কে মুড়ি তাহার আঁচলে ঢালিয়া দিয়া বলে, যা ঘর যা, পালা—। মুড়ি ফাউ আর সে দেয় না।

সে বলে, দাঁড়া ভাই, যাচ্ছি! তাড়াস কেন? বলিয়া ছট্টুলালের দিকে হি হি করিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়। খানিকদূর গিয়া আপন মনে বলে, ছট্টুলালটা ভারী বজ্জাত! কি সব বলে……হাসতে হাসতে পেটে আমার খিল ধরে। বলিয়া ঠোঙা হইতে এক আঁজলা মুড়ি গালে পুরিয়া চিবাইতে থাকে।

লোকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়।

খেঁদা বলে, সর্ লো সর্; অমন রাস্তা লেপ্টে দাঁড়িয়ে থাকিসনে। বলিয়া একটা ঠেলা দেয়।

বয়সও নেহাৎ অল্প নয়,—পঁচিশ পার হইয়া গেছে, কিন্তু হাসিটুকু এখনও যায় নাই। সাদা থান কাপড়খানি পরিয়া কাজকর্ম্ম করে, কিন্তু বিকাল বেলা লালপেড়ে সাড়ীখানি পরা চাই-ই চাই। কপালে একটা টিপ লাগায়, আবার মাথায় সিঁথিতেও সিঁদুর দেওয়া হয়, কিন্তু নিজের খেয়ালে আবার কখন সেটুকু মুছিয়া ফেলে।

বদির মা তাহা দেখিয়া বলে, অ-তরুবালা শুন্‌চিস্?

সে মুখ ফিরায়।

কথায় কথায় তোর বর মরে বাঁচে নাকি?

তরুবালা বলে, বাঁচেই ত! জান বদির মা, সে ছিল……। এমনি এমনি। আমার চেয়ে মাথায় বড়—ঐ অতখানি! চোখ মুখ টানা টানা…বলিয়া হাত দিয়া শাড়ী কাপড়খানির ধূলা ঝাড়িয়া লইয়া ভব্য হইয়া বসে।

বদির মা মুখ টিপিয়া হাসে। পুনরায় বলে, কোথায় গেল সে?

তরুবালা বেশ গম্ভীর হইয়া বলে, আছে, আসবে 'খন দেখবে। বলিয়া গলির মোড়ে রাস্তার দিকে চায়। ত্রস্ত ব্যাকুল দৃষ্টি কাহাকে খোঁজে!

কিন্তু কেউ আসে না। ঘর্ ঘর্ করিয়া গাড়ী ঘোড়া তাহার চোখের উপর দিয়া তীর বেগে দুধারে ছুটিয়া চলে। রাস্তায় একে একে আলো জ্বলিয়া ওঠে। খেঁদা ছাতি বগলে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

তরুবালা ঘরে উঠিয়া যায়। শাড়ীখানি ছাড়িয়া সযত্নে তুলিয়া

রাখে। তাপর হঠাৎ কুলুঙ্গির দিকে নজর করিয়া বলে, ওই যা! পানটা ত খাওয়া হয়নি!—বলিয়া পানটা নাড়িয়া-চাড়িয়া রাখিয়া দিয়া বলে, কাল বিকেলে খাব, আজ থাক্।

খগেনের আফিংয়ের দোকান। নিজেই কেনা-বেচা করে। পাঁচুকে আজকাল আর দোকানে পাঠায় না। কাঁচা পয়সা চুরি করিয়া উচ্ছন্ন দেয়।

খগেন মুখ খিঁচাইয়া বলে, শালার বেটা শালার বয়েস কুড়ি পেরিয়ে গেল, জ্ঞান হ'ল না। বাইরের পয়সা ত কই ঘরে আনতে পাল্লিনে? যত মধু ওই বাপের ইয়েতে—কেমন?

পাঁচু চুপ করিয়া থাকে, মিট্ মিট্ করিয়া চায়,—দেখে বাপ তাহার চলিয়া গেল কিনা!

খগেন আরও রাগিয়া বলে, গয়লা-বৌয়ের কাছে সেদিন প্যাদানি হয়েছিল—বেশ হয়েছিল। বেটা এমন চুরি কল্লি যে ধরা পড়ে' গেলি। বাপ-পিতেমোর নাম ডুব্‌ল' যে হতভাগা! বলিয়া উড়ানীখানা কাঁধে ফেলিয়া গর-গর করিয়া চলিয়া যায়।

পথ আগলাইয়া তরুবালা বলে, আজ নোলকটা আনবে গা?

খগেনবাবু কটমট্ করিয়া চায়। কিন্তু তরুবালা তাহা দেখিয়া হি হি করিয়া হাসে।

খগেনবাবু বলে, নোলক আন্‌ব, না ইয়ে আন্‌ব—আবাগি কোথা-কার! সব তাড়াব একে একে দাঁড়াও! বড মাথায় উঠে গেছ। নে সর—

তরুবালা সরে না। বলে, তবে একখানা চিরুণী? বলিয়া আবার হাসে।

আচ্ছা, তাই হবে। বলিয়া খগেন চলিয়া যায়। খানিক দূর গিয়া আপন মনেই বলে, মাগি এমনিতর ন্যাপান্‌পানা করে আমার সঙ্গে,—লোকে কি সব মনে করে বল দিকি?

তরুবালা ততক্ষণে বদির মার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দেয়। হঠাৎ বলে, আজ আমাদের বিয়ে হবে গো—

বদির মা বলে, আ মর্? কার সঙ্গে বিয়ে?

খিল্ খিল্ করিয়া তরুবালা হাসিয়া আড়ালে চলিয়া যায়। তারপর একটুখানি মুখ বাহির করিয়া বলে, ওই ত খগেনবাবু, চলে গেল!—

পাঁচু তাহাকে পিছন হইতে ঠেলিয়া দিয়া বলে, যাও আমার ঘর থেকে! এ-ঘরে মেয়েমানুষ আসা পছন্দ করি না।

তরুবালার মুখের হাসি শুকাইয়া যায়। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে, আর আসব না।

বড় বড় চোখে পাঁচুর ঘরের দিকে তাকায় বলে,—কি ক'রে চায় আমার দিকে, দেখ্‌লে ভয় করে!

আবার তখনই সে কথা ভুলিয়া যায়। আপন মনে আবার হাসে।

পাঁচু সেই অন্ধকার ঘরে ভাঙা তক্তাটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলে, ওকে রাখা কেন? কি দরকার? ওর থেকে লাভ কি? বলিয়া আফিংয়ের গুলিটা মুখে পুরিয়া এক ঢোক জল খায়। তারপর বলে, বাপ বলে' কি আমার চেয়েও চালাক? কিছু বুঝিনি? বলিয়া উঠিয়া যায়। বাপের হুঁকাটা লইয়া এক ছিলিম তামাক সাজিতে বসে।

অত বেলায় পাঁচ পাত কুড়াইয়া জড়ো করিল—ডালে তরকারিতে ভাতগুলা মাখামাখি। তাহাই একখানি থালায় তুলিয়া দরজাটির কাছে বসিল। তারপর হঠাৎ একবার ছুটিয়া নিজের কোটরে গিয়া ছোট্ট আরসিখানি হাতে করিয়া বলিল, এইবার—এমনি—এমনি হবে। বলিয়া আয়নায় প্রতিফলিত দু'টি ঠোঁটে বার-তিনেক হাত ঠেকাইয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল।

পিছন হইতে পাঁচু বলিল, কি হচ্ছে ?

তরুবালার হাসি ম্লান হইয়া আসিল। আরসিখানি দেখাইয়া বলিল, এই যে—দেখছি।

পাঁচু আজকাল প্রায়ই তাহাকে ঠাট্টা করে। বলিল, মুখ দেখা হচ্ছে বুঝি ?

মুখ দেখছি—হুঁ—ভাত খাব যে—! দেখবে ? বলিয়া পাঁচুর হাতের কাছে ভয়ে ভয়ে সে আরসিখানি বাড়াইয়া ধরিল।

হাতের বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া পাঁচু একটু হাসিল। তারপর একবার দরজার দিকে চাহিয়া বলিল, কি সব ভাত তরকারি জড়ো করেচিস ? বলিয়া তাহার পিঠে একটা খোঁচা দিয়া বলিল, যাও, বেশ মুখ দেখা হয়েছে—এইবার খাওগে! মুখ দিয়ে ত রস গড়াচ্ছে—

তরুবালা বাহির হইয়া গেল। পাঁচু আবার একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, আর একটু রোগা হলে তরুটাকে বেশ দেখতে হ'ত। বলিয়া বিড়িতে আর একটা টান দিয়া পুনরায় বলিল, ছাই হতো!

শাড়ী কাপড়খানিকে চোখের আড়াল, করিতে পারে না। দিনান্তে

শতবার ধূলা ঝাড়িয়া গোছ্ করিয়া রাখে। ছাদে শুকাইতে দিয়া সুমুখে বসিয়া থাকে ও সেইদিকে চাহিয়া গুণ গুণ করিয়া গান গায়।

ওই কাপড়খানির জন্যই যেন সংসারে সে বাঁচিয়া আছে।

খাইতে বলিলে খায়, শুইতে বলিলে শোয়। বাঁচিবার গরজ তাহার নিজের যেন কিছুই নাই।

পাঁচু তাহাকে দেখিলেই বলে, শাড়ী কই তোর? নতুন শাড়ী? বলিয়া হাসিতে হাসিতে শিষ্ দিয়া চলিয়া যায়।

রহস্য-পুরীর পাষাণ শিলায় অনুভূতির তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়ে— যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়।

পাঁচুর সে চাহনি দেখিলে তাহার ভিতরে ভিতরে কাঁপুনি ধরে। জাল দেখিলে হরিণীর যেমন আতঙ্ক হয়।

তবু মুখ ফুটে না; মনে হয় নিজেরই ভুল। বিশ্বাস করিবেই বা কে!

আবার সব ঘুলাইয়া যায়। শাড়ী কাপড়ের আঁচলটা চোখের সাম্নে পত্পত্ করিয়া ওড়ে! চুল কুলাইতে কুলাইতে বলে, ওই যা! আজ যে পান সেজে রাখা হয় নি! বলিয়া কাপড়খানা বগল-দাবা করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়া পান সাজিতে বসে।

সন্ধ্যার পর গাড়ুটা দেয়ালের কাছে রাখিয়া খগেনবাবু বলে, তামাক দে রে—

তামাক লইয়া তরুবালা আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে—ডাক শুনিবার অপেক্ষায়। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া খগেনবাবুর হাতে হুঁকাটা দিয়া সেইখানেই হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়ে।

আপন মনে বাবুর পা দুইটা কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া টিপিতে থাকে।

খগেনবাবু তামাকে টান দিয়া বলে, তোকে ত আমি ঝির মতন দেখিনি, নিজেদের মতন করেই রাখি। তুই বেটি ওই মাঝে মাঝে বেয়াড়ামো করিস, ওইতে রাগ হয়—

তরু আবার হাসে। মাথার চারটি চুল খগেনের পায়ের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

নেপথ্যে গিন্নির গলা শোনা যায়।

খগেনবাবু একটু কাসিয়া বলে, পাঁচু কই গা ?

ভীতিব্যাকুল দৃষ্টিতে তরুবালা এদিক-ওদিক চায়। খগেনবাবু সরিয়া বসে।

তরু বলে, বাড়ী নেই, বাড়ী নেই আমি জানি— আরও কি বলিতে যায়—পারে না। বলিবার ভাষা কুলায় না।

•

ছোট আরসিখানি সুমুখে রাখিয়া খোঁপা বাঁধিতেছিল। পাঁচু আড়াল হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল, খোঁপা বেঁধে কি হবে, দেখবে কে ?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে হাত-পা চলে না। তবু একটু হাসিয়া তরুবালা বলিল, খোঁপা বাঁধছি—অমনি—

পাঁচু এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, তোমার বিয়ে হয়েছিল তরুবালা ?

তরুবালার সে কথা মনে নাই। বলিল, কবে ?

হি হি করিয়া পাঁচু হাসিল, বলিল, কবে তা আমি কি জানি !

তবে হয়নি—বলিয়া তরুবালা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল, একদিন হবে, ওই বদির-মা বলছিল—ও বড্ড হাসে—

পাঁচুর সে কথা শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। একবার উঁকি মারিয়া

বাহিরের দিকে চাহিল। তারপর সরিয়া আসিয়া বলিল, একটা কথা বলব শুনবে?

'উঁ' বলিয়া তরুবালা উদাসদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইল।

—হুঁ। আচ্ছা থাক্‌গে। বলিয়া পাঁচু একবার বাহিরে চলিয়া গেল। আবার তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোমায় কিন্তু দেখতে বেশ তরু—

তরু চুপ করিয়া তখনও হাসিতেছিল। হঠাৎ বলিল, আরও—আরও ভাল দেখতে ছিলুম—বুঝলে? আরও ভাল। খু—ব……

তা দেখতেই পাচ্ছি। বলিয়া তাহার চিবুকটা নাড়িয়া দিয়া পাঁচু হন্ হন্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

•

খাইতে বসিয়া খগেন বলে, মুখের দিকে অমন ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে আছিস্ কেন রা? খাওয়া দেখছিস্ বুঝি?

তরুবালা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলে, দেখছি ত—অত ক'টি ভাত খাও তুমি? আমি এত……বলিয়া নিজের আহারের পরিমাণটা দেখাইয়া দেয়।

গিন্নী বলেন, পথ ছেড়ে বস্ বাপু, তোর ও আদিখ্যেতা ভাল লাগে না। আবার একটু থামিয়া বলেন, উঠে যা ওখান থেকে—মানুষকে খেতে দে। অত মাথামাখি কেন?

খগেন বাবু বলে, থাক না গা! চুপ করে বসে রয়েছে, থাকুক না কেন!

গিন্নী গর্ গর্ করিয়া বলে, থাকবে থাকুক,—আমিই চলে যাচ্ছি। বলিয়া হঠাৎ স্বামীর পিঠে একটা আঙ্গুলের টিপ দিয়া গিন্নী বলে, ওই দেখ, ওই মুখ দিয়ে দরানি গড়াচ্ছে—খেতে খেতে চেয়ে দেখলে ঘেন্না

করে না? বলিয়া কাছে গিয়া গিন্নী চোখ পাকাইয়া বলে, যা উঠে যা—আবাগি! পাগল ছাগলের একগুণ বেশী!

তরুবালা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া যায়। ঘরের ভিতর গিয়া জানালার ধারে বসিয়া গান ধরে,—'ভালবাসি চাঁপাফুল—'

পাশের ঘরে পাঁচু বসিয়া তাহার গান শুনিতে শুনিতে এদিক ওদিক তাকায়।

খানিক বাদে উঠিয়া খগেন বাবুর চটি জুতা জোড়াটি আঁচল দিয়া মুছিয়া রাখে।

খগেনবাবু তাহা পায়ে দিয়া দোরের কাছে আসিতেই সে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলে, আজ চিরুণী আন্‌বে?

তাহার মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া খগেনবাবু একটু হাসিয়া বলে, চুল কই যে চিরুণী দেবে মুখপুড়ী?

তরু আবার বলে, আন্‌বে বল?

সর্ সর্, বেলা গেছে, দশটার সময় দোকান খোলবার কথা—

কিন্তু তরু ছাড়ে না। ঠোঁট দুইটির কাছে অবজ্ঞাত অন্তরাত্মার সমস্ত ইতিহাসটি গুঞ্জন করিয়া ওঠে। সারা জীবনটিতে যে কথা অব্যক্ত রহিয়া গেছে তাহাই বলিবার চেষ্টায় মুখ তুলিয়া ধরে, কিন্তু তবুও বলিতে পারে না। নিমেষে সমস্ত হারাইয়া যায়। আস্তে আস্তে বলে, আন্‌বে বল?

আন্‌ব, আন্‌ব। বলিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া খগেনবাবু বাহির হইয়া যায়।

তরুবালা একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া থাকে। চোখে জলও আসে।

কথার প্যাচে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। পাঁচুর মনের কথা বুঝিতে পারে না। যখন তখন পাঁচুকে দেখিয়া বলে, আরও ভাল দেখতে ছিলুম—বুঝলে ?

পাঁচু তামাক টানিতে টানিতে হাসে, বলে, তোমার চুল আরও কালো ছিল, না তরু ?

তরু চুলের রাশ লইয়া দেখে। মুখের উপর চুলগুলি ঝাঁপাইয়া পড়ে। বলে, ছিলই ত, আরও অনেক বড় বড়—বদির-মা বলে—। বলিয়া হাসে।

আগেকার সে আতঙ্ক মন হইতে মুছিয়া গেছে। নির্জ্জনে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেও তাহার বাধে না। পাঁচু চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেও চুপ করিয়া থাকে। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চায়, আবার কখনও ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে।

ছাদের পাঁচিলের কাছে বসিয়া রৌদ্রে চুল শুকাইতেছিল। সেদিকে একবার উঁকি মারিয়া পাঁচু ছোট বোনটাকে বলিল, মা কোথায় রে ?

গঙ্গা নাইতে—সে বলিল।

পাঁচু ছাদের কাছে সরিয়া গেল। নিকটে গিয়া বলিল, নিজের তদ্বির করতেই ত সারাদিন গেল—

তরুবালা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল। সেই পুরাতন গানটার একটা কলিও আস্তে আস্তে গাহিল, 'ভালবাসি চাঁপাফুল—'। তারপর হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা মানুষ মরে যায়, আবার ফিরে জন্মে ? কই, বল দেখি। বদির-মা বলে, ভূত হয়।

পাঁচু পিছন ফিরিয়া ছোট বোনটাকে বলিল, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

সে চলিয়া যাইতেই পাঁচু সরিয়া আসিয়া বলিল, ওসব কথা ভেবে কি হবে তরু ?

ভাবব না ?—আচ্ছা।

তোমার বুঝি কিছু ভাল লাগে না ?

তরু মুখ ফিরাইয়া নিরর্থক হাসি হাসিল। তারপর বলিল, খুব লাগে। বদির-মা বলছিল—

পাঁচু সরিয়া আসিয়া তাহার আঁচলের খুঁটটা লইয়া হাতের মধ্যে পাকাইতে পাকাইতে বলিল, তরুবালা।

তরুবালা মুখ তুলিল।

ক্রূর সর্পের মত চাহিয়া পাঁচু একটু হাসিয়া বলিল, একটা কথা বলব —রাখবে ?

কি কথা তরু তাহা বুঝিল না। বলিল, খুব রাখব। যা বলবে তাই শুনব।

পাঁচু তাহার একটা হাত খপ্ করিয়া ধরিয়া বলিল, সত্যি তোমায় আমার খুব ভাল লাগে। শুনবে ?

হাঁ শুনব—খুব শুনব। বলিয়া তরু হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

ছোট মেয়েটা হাত পা নাড়িয়া মাকে কি সব বলিয়া দিয়াছে।

তাই হঠাৎ গেল কাল রাতেই পাঁচু বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় পলাইয়া গেছে।

আশেপাশে কানাকানি চলিতেছিল।

বদির-মা জানলায় মুখ বাড়াইয়া কি সব বলিয়া গেল···আগুন আর ঘি···

মার খাইয়া গায়ে পিঠে দড়া দাগ বসিয়া গেছে। মেয়েটা যন্ত্রণায় সারা সকাল ছটফট করিয়াছে।

পাঁচুকে খোঁজাখুজি করা হইয়াছে, কিন্তু পাওয়া যায় নাই। গিন্নি কাঁদিতেছেন। রাগটা তরুবালার উপর।

খগেনবাবুর রাগ তখনও যায় নাই। কুঠুরী হইতে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে সুমুখে আনিয়া মার। হারামজাদী!—আবার পিঠে এক চাপড়!

গিন্নী অগ্নিমুখী হইয়া কাঁচি আনিয়া তাহার চুল কাটিয়া দিল।

মার খাইয়া পলাইতেও জানে না। ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া বসিয়া থাকে, ছোট মেয়ের মতন।

কি দোষ যে করিয়াছে তাহা মনেই পড়ে না। কালকার কথা আজ তাহার মনে থাকেই বা কেমন করিয়া? পাঁচু বাড়ী নাই এই কথাই জানে। কিন্তু তাহার জন্য সে মার খায় কেন?

চুলগুলাও কাটিয়া লইল! কি আর হইবে? খানিকক্ষণ বাদে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

শাড়ী কাপড়খানি তখন ধূলায় লুটাইতেছে।

সেখানিকে তুলিয়া লইয়া শশব্যস্তে কাঁপিতে লাগিল। আজ সকাল হইতে সে ইহার খোঁজ লয় নাই।

চোখ দিয়া তখন টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। কাপড়খানি বুকে করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নি বলেন,—তাড়াও ওকে।

খগেনবাবু বলিল,—হ্যাঁ, তাড়াও—

মুখে বললে হবে না,—ওই দেখ দাঁড়িয়ে···

খগেনবাবু জুতা লইয়া তাড়া করিলেন।

গিন্নি বলিলেন, মারো, মারো—ন্যাকা সাজছ কেন ?

সে অপমান সওয়া যায় !

হাতের জুতা তরুবালার পিঠের উপর ছিঁড়িয়া গেল !

বেদনায় তরুবালা কেঁচোর মত পিঠমোড়া খায়, চোখ দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া জল পড়ে, আর ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাহার দিকে তাকায়।

সে চাহনির যেন অর্থ আছে !

গিন্নির লাথি খাইয়া সে রাস্তায় গিয়া পড়ে। উঠিয়া আবার চলিতে থাকে।

গিন্নি বলে, শাড়ী দিয়ে যা মাগী, শাড়ী দিয়ে যা।

ফিরিয়া আসিয়া শাড়ীটি দরজার কাছে নামাইয়া দেয়।

বেরো এবার !

মেয়েটা এদিক-ওদিক তাকায়। খগেনবাবুকে আর দেখিতে পায় না। তখন সে ওঠে। উঠিয়া চলিতে থাকে।

চলে আবার ফিরিয়া চায়। আবার চলে।

কতদিন চলিয়া গেছে। পাঁচু ঘরে ফিরিয়াছে। কিন্তু তরু আর আসে না।

রাস্তায় খগেনবাবুকে দেখিয়া একদিন সে পায়ের ধূলা লইয়াছিল।

গায়ে কাপড়ও নাই। লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরায়। রাস্তায় রাস্তায়

ঘোরে। যা' তা' বকে। লোকের বাড়ী ভোজকাজে এঁটো পাতের কাছে গিয়া শকুনীর মত জায়গা জুড়িয়া বসে।

স্ত্রীলোককে চলিতে দেখিলেই বলে, আমার কাপড়খানা পরেছ? আবার বলে, ওদের বাড়ী কাজ কর নাকি?

কখনও গান ধরিয়া দেয়, 'ভালবাসি চাঁপাফুল'—

ট্রেণের প্রতীক্ষায়

একদা তিনটি বন্ধু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পদব্রজে নয়, ট্রেণে করিয়া তাহারা পশ্চিমের অনেকগুলি স্বাস্থ্যকর জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এইবার তাহাদের ফিরিবার মুখ, তাহার কারণ-ট্রেণের টিকিটের নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইতে আর বড় বেশী দেরি নাই। তাহা ছাড়া সস্তায় ইহার চেয়ে আর বেশী ভ্রমণ করাও চলে না।

বিহার প্রদেশের একটি ছোট স্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয়। কিন্তু বদল করিতে গিয়া শোনা গেল, কয়েকটি স্টেশন আগে গাড়ী লেট্ হইয়াছে, আসিতে বিলম্ব হইবে। নিরুপায় হইয়া তিনটি বন্ধু কি করিবে তাহাই স্থির করিতে লাগিল।

অতঃপর স্থির হইল তিনজনে তিনটি গল্প বলিবে। কয়েক প্যাকেট সিগারেট কিনিয়া তাহারা গল্প করিতে বসিয়া গেল।

হেমন্তের জ্যোৎস্নারাত। রাত অনেক। স্টেশনের সাড়াশব্দ ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে। দূরে কোথায় একখানা শান্টিং ইঞ্জিনের সোঁ সোঁ করিয়া শব্দ শোনা যাইতেছিল। ওপারের

প্লাটফরমে দু' একটা ফেরিওয়ালা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। একটা খোঁড়া কুকুর লাইন্ পার হইয়া এইমাত্র একদিকে ছুটিয়া গেল। চারিদিক ঠিক নির্জ্জন নহে, কিন্তু নিস্তব্ধ।

মাথার পরে নক্ষত্রখচিত নির্মেঘ আকাশ, চাঁদের আলোয় প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়া একটা সিগারেট্ ধরাইয়া প্রথম বন্ধু গল্প সুরু করিল।

"এই তোমার সাঁওতাল পরগণার কাছেই, অনেকগুলি স্বাস্থ্যকর স্থান আছে জানো ত'? সে জায়গাটার নাম রাহু গ্রাম। পাহাড়ী জায়গা, প্রায় চারিদিকে প্রকাণ্ড মাঠ, মাঠ আর ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছুটিতে পর্ব্বে কোনো কোনো বাঙালী ওদিকে বেড়াতে আসেন, থাকেন, আবার চলে যান্। কাছেই ছোট একটি সাঁওতালি গ্রাম।

'কিছুকাল আগে একটি অবস্থাপন্ন পরিবার রাহুগ্রামে বেড়াতে আসেন। কর্ত্তার একটি মাত্র মেয়ে, মেয়েটি অত্যন্ত রুগ্ন, তখনো অবশ্য বিবাহ হয়নি। মা নেই, পিসিমা ছিলেন সঙ্গে। জাতিতে বোধ হয় যেন তাঁরা ব্রাহ্ম।

'জল হাওয়ায় এবং জায়গার গুণে মেয়েটি একটু একটু করে' সেরে উঠল। চলে' ফিরে' বেড়ায়, বই কাগজ পড়ে, গান গায়। কখনও দেখা যায় ফটকের ধারে ফুলগাছগুলিতে সে জল দিচ্ছে! একহারা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মেয়েটি যেমন শান্ত, তেমনি কোমল। নাম তার সুমতি। সুমতির বয়স কুড়ির বেশী নয়। সুস্থ হবার পর ধীরে ধীরে সে সুন্দরী হয়ে উঠেছিল।

'হাঁটতে যখন তার আর কোনো কষ্ট হয় না, তখন সে এখানে ওখানে প্রতিদিন খানিকটা পথ হেঁটে ঘুরে ফিরে বাড়ীতে এসে ঢুক্‌তো। তার

সঙ্গী বিশেষ কেউ ছিল না। একদিন স্নমতির ইচ্ছা হলো সে ধানক্ষেত সমস্তটা হেঁটে আসবে। হেঁটেই এল, হাঁটতে তার সত্যিই ভাল লাগে, বাড়ী ফিরল সে ক্লান্ত হয়ে।—এমনি করে' নিজের খেয়ালে ভ্রমণ করে' বেড়ানোটা তার অবারিত হয়ে উঠ্ল। শালবনের পথে এঁকে বেঁকে সে যখন নিজের মনে চলে যেত, মনে হতো সে এই অঞ্চলের বনদেবী। ক্বচিত কোনো কোনো পসারী ও পসারিণী থম্কে দাঁড়িয়ে এই রূপসম্রাজ্ঞীটির পানে অনিমেষ নয়নে দেখে যেত।

সেদিন অপরাহ্নের দিকে পশ্চিম আকাশে একখণ্ড মেঘ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। স্নমতি একবার সেদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরবার চেষ্টা করল। পথ অনেক দূর। চল্‌তে চল্‌তে সেদিন হঠাৎ স্নমতির মনে হলো, তার পিছনে কিছুদূরে কে একজন আসছে। মুখ ফিরিয়ে সে একবার তাকালো। এই লোকটাকে ক'দিন থেকে সে লক্ষ্য করছে, ঠিক এমনি সময়—অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায়—দূর থেকে স্নমতির অনুসরণ করাই তার কাজ। সেদিন কাছাকাছি থাকায় স্নমতি তাকে ভাল করে' দেখ্ল। কালো কষ্টিপাথরের মত লোকটার দেহ, বিস্তৃত। মাথায় বড়ো করে' চুল বাঁধা, গলায় প্রবালের মালা, মাথায় ও কানে প্রবালের অলঙ্কার। চোখ দুটো প্রখর, উজ্জ্বল,—কিন্তু সে চোখ দীর্ঘায়ত। স্নমতির দিকে অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল।

স্নমতি ভীরু নয়, থম্‌কে দাঁড়িয়ে লোকটার উদ্দেশ্য সে জানবার চেষ্টা করল। পা টিপে টিপে শিকারী এসে যেমন করে পাখী ধরে লোকটা তেমনি অপলক দৃষ্টিতে কাছে সরে এল। কোন কথা বলল না, শুধু একটু হাসল। সে যে হাসল তার প্রমাণ শাদা দু' পাটি ধবধবে দাঁত সে স্পষ্ট করে' দেখালো।

স্নমতি জিজ্ঞেস করল, কি চাও ?

লোকটা হাবাও নয়, বোবাও নয়, তবু শুধু একটি কথাই জানালো, তার নাম ভীর। চোখে তখন তার উগ্র আনন্দ, অপরিমিত উল্লাস, স্নমতির কাছে দাঁড়াতে পেয়ে বীরতনু যেন তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তার সেই কঠিন বলিষ্ঠ দেহ যেন ফেটে পড়তে চাইছে, আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না বলে'। হাতে ছিল তার একটি ছোট গাছের শাখা। শাখায় কয়েকটি তাজা সবুজ পাতা। সেটি সে স্নমতিকে উপহার দিল। দিয়ে সে দাঁড়িয়েই রইল। শাখাটি নিয়ে স্নমতি নিজের পথে চল্‌তে লাগল, কিন্তু ভীর তার পিছু ছাড়ল না। এই হলো আমার গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ। এর পর থেকে কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটি ঘোরাল হয়ে উঠল। ভীরের আনাগোনা চল্‌ল প্রত্যহ। স্নমতির আশে পাশে, কাছে দূরে, আড়ালে অন্তরীক্ষে ভীর দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। লোকটার যে কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল মনে হয় না, কিন্তু এমনিই। তার বাড়ী ঘর নেই, পরিজন নেই, তার দিন নেই, রাত নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই—স্নমতিকে চোখে চোখে রাখাই হলো তার কাজ। স্নমতির বাবা সব শুনলে, কিন্তু লোকটাকে তিনি আজো দেখতে পাননি। তিনি সতর্ক হ রইলেন, কিন্তু এ সতর্কতা যে কার জন্য তা তিনি বুঝতেই পারলেন না।

'বাংলোর পাশে একটা জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা গা হেলান্ দিয়ে ভীর বসে থাকত। বসে থাকত স্নমতির ঘরের দিকে, একান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে। অন্ধকার রাতে সে বাংলোর চারিদিকে পায়চারি করে' বেড়াত'। স্নমতির জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌ল। তার এড়াবার উপায় ছিল না, পালাবার পথ ছিল না। কোনো কোনো

সকালে উঠে সে দেখতে পেত' তার জানলার ধারে হয়ত একরাশি ফুল, কিম্বা কোন অজ্ঞাত গাছের শাখা, নয়ত একটি ফুল। এ যে উপহার তা সে বুঝ্‌ত। জানলার বাইরে তাকালেই সে দেখত ভীরের ছায়া, রাত্রে আলো জ্বেলে বসে' থাকতে থাকতে তার মনে হতো ভীর এসে তার সুমুখে দাঁড়িয়েছে, করাল কৃষ্ণ ছায়া, ভয়ঙ্কর,—সর্ব্বশরীর তার ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌ত'। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে ভীরকে স্বপ্ন দেখ্‌ত, ডরিয়ে উঠ্‌ত', ভয়ে তার চোখে জল আস্‌ত।

'এ গল্পকথা নয়, সত্য ঘটনা। বহুদিন এমনি করে পার হয়ে গেল। এ দুঃস্বপ্নের বোঝা সুমতি বইতে পারত না, আবার সে শুকিয়ে উঠতে লাগল। এবার রোগ নয়, দুশ্চিন্তা। এ দুশ্চিন্তা ও বন্দীজীবন সইতে না পেরে সুমতি এক একবার আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌ত! রাহু যেন তাকে একটু একটু করে' গ্রাস করছে!

'অবশেষে একদিন পিতা ও পিসিমাকে নিয়ে এদেশ তাকে ত্যাগ করতে হলো। কয়েকটি স্টেশন পরে তার এক দূরসম্পর্কীয় ভাই থাকতেন। তিনি স্টেশন মাস্টার। স্টেশনের পাশেই তাঁর একটি চমৎকার বাংলো। সেই বাংলোয় সবাই এসে উঠলেন।

'সুমতির মুখে আবার হাসি ফুটলো। যদিও সে মাঝে মাঝে অন্যমনা হয়ে থাকে, তবুও তার শরীর ভাল হতে লাগল। এমন সময় একটি ছেলের সঙ্গে সুমতির হলো প্রেম। ছেলেটির নাম রঙ্গলাল। রঙ্গলাল সুমতিকে সত্যই ভালবেসেছিল। এই দেশেই সে নতুন ডাক্তারী করতে এসেছে।

'কয়েক মাসের মধ্যেই রঙ্গলালের সঙ্গে সুমতির বিয়ে হলো। সুমতি এল শ্বশুর বাড়ী। শ্বশুর বাড়ীর সে একমাত্র বউ

'দিন চলছিল। স্বামী আর স্ত্রী। স্বামী যায় [illegible] স্ত্রী তখন একা। বৃদ্ধা শাশুড়ীর একটু আধটু সেবা [illegible] হয়। স্বামী ফিরে এলে আবার একটু সোরগোল চলে। ব্রজলাল প্রেমিক স্বামী।

তবু কোনো কোনো নিভৃত রাত্রে সুমতির চোখের ঘুম ছুটে যায়। উঠে বসে দেখে, স্বামী তার অকাতরে নিদ্রিত। মনে হয়, [illegible] কোথায় কে যেন গান ধরেছে। সে গানের সুরে জঙ্গলের করুণ রাত্রির বিলাপধ্বনি! তারপর মনে হয় সে গানের আ[illegible] দূরে নয়, খুব কাছেই—এমন কি তার জানালার নীচে সরকা[illegible] রাস্তাটার ধারেই। গান শুনতে শুনতে সুমতির সর্ব্বাঙ্গ যেন অব[illegible] হয়ে আসে, তার যেন পক্ষাঘাত হতে আর দেরি নেই! একদিন কিন্তু হঠাৎ এ রহস্য উদ্ঘাটিত হলো। কিন্তু সে একটা অদ্ভুত গল্প—যে গল্পের শেষ নেই।